আমার জীবনের সত্তর বছর

ডাঃ মেজর (অবঃ)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজ হোসেন

www.pathagar.com

আমার জীবনের সত্তর বছর

ডাঃ মেজর (অবঃ)
আল্‌হাজ্জ মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজ হোসেন

সেবা পাবলিশার্স
সিবি-১১০, মহাখালী,
ঢাকা-১২১৫

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
লেখক স্বয়ং
বাসা নম্বর সি, ডব্লিউ. এন. (সি) ৪০
রাস্তা নম্বর-৩৭, গুলশান মডেল টাউন
ঢাকা-১২১২। ফোনঃ ৮৮৪৬২১।

প্রথম মুদ্রণ ঃ
ডিসেম্বর ১৯৯৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
অক্টোবর ১৯৯৭

প্রচ্ছদ অংকন শিল্পী ঃ
শুভাষ চন্দ্র

মুদ্রণ ঃ
সেবা প্রিন্টিং প্রেস
সি.বি. ১১০ মহাখালী রেলগেট
ঢাকা-১২১৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সেবা পাবলিশার্স
সি.বি. ১১০ মহাখালী রেলগেট
ঢাকা-১২১৫

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সৃষ্টি কর্তাকে মনে রাখিয়া যাহারা এই পৃথিবীতে ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহাদেরকে এই বইটি উপহার দিলাম।

মুঃ মাহ্‌ফুজ হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের অগ্রকথা

দ্বিতীয় সংস্করণ

আমার জীবনের সত্তর বছর বইটি আমি নিজের জীবন-বৃত্তান্ত লিখার জন্য প্রকাশ করি নাই। আমি বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের অন্যান্য সকলের মত একজন সাধারণ মানুষ। ছোটকাল হইতে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন ধারায় নিজেকে চালিত করিয়াছি। আমার জীবনের ঘটনাবলীর সাথে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলোকন করিয়াছি সেইগুলি এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ১৯৪৩ সালের মন্বান্তরের কথা এবং ১৯৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষার ঘটনাবলী এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমার দেখা ঘটনাবলী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিখিয়াছি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছি– যাহা ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থে চালিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে দরিদ্র জন গোষ্ঠী আরো দরিদ্র হইতেছে। আমি যে বিষয়গুলি লিখিয়াছি সেইগুলি কাল্পনিক নয় বরং সত্য ঘটনাগুলি গল্প আকারে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই বইটি পড়িয়া যাহা জানিবে তাহা কাল্পনিক নয় বরং সত্য ঘটনাগুলি গল্প আকারে জানিবে।

বিয়াল্লিশ বছর নিজ পেশায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আমার স্মরণ ভান্ডার হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি এবং এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার পুরাতন কাগজপত্র হইতে বেশ কিছু ঘটনা উদ্ধার করিয়াছি।

আমি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি লইয়া এই বইটি লিখি নাই। আমার এই বইটি লেখার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আমরা সবাই যদি আমাদের কর্ম-বহুল জীবনের ঘটনাবলী কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কিছু জানিবে এবং নিজেদেরকে বর্তমানের সাথে তাল মিলাইয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

আমার প্রথম সংস্করণের বইটিতে কিছু বানান এবং ভাষাগত ত্রুটি ছিল। বর্তমান সংস্করণের সেইগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করার চেষ্টা করিয়াছি। এই কাজে এবং পুস্তকটির সার্বিক মানোন্নয়নে বন্ধুবর প্রফেসর ডঃ এ, কে, এম, আমিনুল হক তাঁহার মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়া পুস্তকটির সার্বিক মানোন্নয়নে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণের বইটি পাঠ করিয়া অনেকে পত্র লিখিয়াছেন, অনেকে টেলিফোন করিয়াছেন এবং অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিমত প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের স্বপ্রসংশা অভিমত আমাকে পুনঃমুদ্রণের উৎসাহ যোগান দিয়াছে। আমার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণও যদি সকলের নিকট সমাদৃত হয় তাহা হইলে আমার এই প্রচেষ্টাকে সফল মনে করিব।

মুঃ মাহফুজ হোসেন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আমার ছোট বেলার কথা জন্মস্থান, পিতার কর্মজীবন, সে যুগের শিক্ষা এবং সমাজ	৯
২.	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং সেই সময়কার মন্বান্তরের কথা	১২
৩.	ভারতবর্ষের বিভক্তি, মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা (১৯৪৪-১৯৪৬)	১৪
৪.	স্কুল জীবনের কিছু কথা	১৫
৫.	ঢাকা কলেজে পড়ার সময় এবং ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রাক্কালে আমাদের দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছি (সময় জুলাই ১৯৪৬– আগস্ট ১৯৪৭)	১৮
৬.	পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তানের দূরবস্থা, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী	২১
৭	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের কথা	২৪
৮.	অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা	২৬
৯.	আমাদের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক (ডিসেম্বর ১৯৪৮-নভেম্বর ১৯৫৫)	৩০
১০.	সেই যুগে ডাক্তারি পাশ করার পর চাকুরীর অবস্থা (নভেম্বর ১৯৫৫ –ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭)	৩৫
১১.	মিলিটারী চাকুরীতে কর্মব্যস্ততা এবং স্মরণীয় ঘটনাবলী (ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ – জুন ১৯৭০)	৩৯
১২.	সামরিক চাকুরীর প্রথম কর্মক্ষেত্র। কোহাট সেনানিবাস	৩৯
১৩.	চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কর্মজীবন।	৪৩
১৪.	ঢাকা সেনানিবাসে আমার কর্মজীবন।	৪৫
১৫.	কুমিল্লা সেনানিবাসে আমার ব্যস্ততাপূর্ণ কর্মজীবন।	৪৮
১৬.	এ. এফ. আই. পি রাওয়ালপিন্ডিতে প্যাথোলজি ট্রেনিং (২৫শে মে ১৯৬৪-১৭ মে ১৯৬৫) এবং আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ)	৫০

www.pathagar.com

১৭. সি.এম.এইচ মালির ক্যান্টনমেন্ট (করাচীতে) কর্মজীবন (১৭ই মে ১৯৬৬– ৩রা মার্চ ১৯৬৯) ৫৪

১৮. রংপুর ১০ ফিল্ড এম্বলেন্স হাসপাতালে কর্মরত জীবন (৩রা মার্চ ১৯৬৯-১৬ই জুন ১৯৭০) ৫৬

১৯. সামরিক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর কর্ম-তৎপরতা ৫৮

২০. হোটেল ইন্টারকন্টিন্যালে মেডিক্যাল অফিসার রূপে যোগদান এবং পরবর্তীকালে হোটেল শেরাটনে চাকুরী। (২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ – ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৮৬) ৬০

২১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেশ শাসনের ব্যাপারে আমার অভিমত। ৬৩

২২. দেশ গড়ার ব্যাপারে আমার কার্যক্রম ৬৬

২৩. বুদ্ধিজীবি এবং মৌলবাদীদের ব্যাপারে আমার অভিমত ৬৮

২৪. মাহফুজ ওয়েল ফেয়ার ক্লিনিকে এবং সমাজ সেবায় কর্ম ব্যস্ততা ৬৯

www.pathagar.com

আমার জীবনের সত্তর বছর

১

আমার ছোট বেলার কথা
জন্মস্থান, পিতার কর্মজীবন,
সে যুগের শিক্ষা এবং সমাজ

আমার জন্ম শনিবার দিন সকাল ১০টায় ১৩ই কার্তিক ১৩৩৩ সনে। আমার জন্ম হয় নানার বাড়ীতে। আমাদের গ্রামের নাম কুশাইরবাগ, পোস্ট অফিস এবং থানা কেরানীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা। মা-বাবার বাড়ী একই গ্রামে। আমি আমার মার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান। বাবার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার মাকে বিবাহ্ করেন। আমার বয়স যখন নয় মাস তখন আমার মা মৃত্যু বরণ করেন। দাদি শিশুকাল হইতে আমাকে লালন পালন করেন এবং দুই ফুফু ও একমাত্র বৈমাত্রেয় বড় বোন তাঁহাকে সাহায্য করেন। একটু বড় হওয়ার পর দেখিয়াছি আমার ছোট বেলার কেরোসিন গ্যাস স্টোভ, ছোট ছোট বালতি, ছোট ছোট বাটি এবং দুধের বদনা (সে যুগে ফিডিং বোতল ছিল না)। আমার পিতা জনাব মোঃ ইয়াকুব মিয়া একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার মাতার নাম ছিল আমিরননেসা। আমার দাদার নাম ছিল মোঃ ইয়াসিন মোল্লা। তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন।

আমার পিতা তদানিন্তন আসাম প্রদেশের রঙ্গিয়া নামক স্থানে ব্যবসা করিতেন। রঙ্গিয়া আসামের রাজধানী গৌহাটির ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রঙ্গিয়া কামরুপ জেলার একটি মহকুমা শহর এবং রেলওয়ে জংশন। সেখানে আমাদের দুইটি দোকান ছিল। একটি রঙ্গিয়া বাজারে এবং আরেকটি ষ্টেশন রোডে। এই দোকান দুইটিতে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুঁতি, জুতা এবং মুদি দোকানের সামগ্রী বিক্রি হইত।

আমাদের নিজস্ব এলাকার গ্রামগুলির অধিকাংশ লোক ব্যবসায়ী ছিল। আসামের তেজপুর, তিন সুকিয়া ডিব্রগড়, শিব সাগর, নওগাঁও, গৌহাটি, মঙ্গলদই, রঙ্গিয়া, নলবাড়ী, টিহু, বড় পেটা, গোয়াল পাড়া, ধুবড়ি এবং আরো অনেক জায়গায় এই এলাকার লোকদের ব্যবসা ছিল।

আমি ছোটকাল হইতে পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলাম। বাবা ব্যবসা নিয়ে রঙ্গিয়ায় থাকিতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসিতেন। আমার বয়স যখন প্রায় ছয়

www.pathagar.com

বছর তখন আমার দাদি আমাকে মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট আরবী পড়ার জন্য দিয়ে আসেন। হেকিম মৌলভী আবদুল গফুর সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন। এরপর বাবা একবার দেশে আসিয়া পার্শ্ববর্তী মান্দাইল গ্রামের নিবারণ পন্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করাইয়া দেন। নিবারণ পন্ডিতের পুরো নাম ছিল নিবারণ চন্দ্র পাল। মান্দাইল ছিল হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। এই গ্রামের লোকেরা শিক্ষায় বেশী অগ্রগামী ছিল। নিবারণ পন্ডিতের তিনটি টিনের ঘর ছিল ; রাস্তার পারে বড় টিনের ঘরটিতে পাঠশালা ছিল এবং বাকী ঘরে নিবারণ পন্ডিত পরিবার নিয়া বাস করিতেন।

পন্ডিত মহাশয়ের তিন কন্যা ছিল এবং কোন ছেলে সন্তান ছিল না। কন্যাদের নাম ছিল সাধনা, বাসনা এবং কামনা। বাসনার বয়স তখন ২০-২২ বছর ছিল। সে বুদ্ধিমতি ছিল এবং অনেক সময় আমাদেরকে পড়াতো। পন্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় শিশু শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৫০-৬০ জন ছাত্র ছিল। কোন ছাত্রী ছিলনা।

সকালে মসজিদে আরবী পড়িতাম এবং পন্ডিতের পাঠশালায় ১০টা হইতে ২টা পর্যন্ত শিশু শ্রেণীতে পড়িতাম। প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়ার পর পন্ডিতের স্কুল পার্শ্ববর্তী গ্রামের কালিন্দী হাইস্কুলের সাথে মিশিয়া যায় এবং পন্ডিত মহাশয় সেই স্কুলের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে শিশু শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই এবং প্রথম শ্রেণীতে পদার্পন করি। কালিন্দী হাই স্কুলে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রমোশন পাই। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রমোশন পাই। এরপর তৃতীয় শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত সেই স্কুলে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন পাই। মসজিদে দুই/তিন বছরের ভিতর কায়দা, আমপাড়া, নামাজ শিক্ষা এবং কোরআন-শরীফ শেষ করিয়া মসজিদের শিক্ষা সমাপ্ত করি।

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।" কবির এই কথাটি অতি সত্য। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি আমাদের ক্লাশের মিন্নত আলী পন্ডিত সাহেব একদিন বলিলেন তোমাদের অনেকে উকিল, ডাক্তার এবং দারোগা হইবে এবং আমি মাস্টারই থাকিয়া যাইব। তবে আমি সবচেয়ে খুশী হইব যখন দেখিব তোমরা আমারই ছাত্র ছিলে। পন্ডিত সাহেবের সেই কথাগুলি আমার মনে খুব কাটিয়া ছিল এবং তখন হইতে স্থির করিলাম যে আমি ডাক্তার হইব।

আমাদের সময় হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসায় ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল কৃষক কিন্তু জমির মালিক ছিল হিন্দু

www.pathagar.com

জমিদারগণ। মুসলমানগণ নিষ্পেষিত ছিল এবং হিন্দু মহাজনদের দ্বারা শোষিত ছিল। শেরেবাংলা এ. কে. এম. ফজলুল হক নিষ্পেষিত মুসলমানদের রক্ষার জন্য ঋণ শালিসী বোর্ড আইন পাশ করেন।

এই আইনের মাধ্যমে তিনি গরীব মুসলমান কৃষকদেরকে হিন্দু মহাজন এবং জমিদারদের শোষণের বেড়াজাল হইতে রক্ষা করিলেন।

ছোট বেলা হইতে আমি পড়ার সাথে সাথে (ফাঁকে ফাঁকে) সংসারের বিভিন্ন কাজ করিতাম, যেমন বাড়ীর নামায় সাকসব্জি লাগানো, গাছ হইতে ফল পারা, ঝরে পরিয়া যাওয়া গাছের ডাল গুলি লাকড়ি করা, পুকুরে জাল দিয়া বা ছিপ দিয়া মাছ ধরা এবং হাট-বাজার করা। ১৯৩৭-৩৮ সালে জিনিষ পত্রের দাম অবিশ্বাস্য কম ছিল। একমন চাউল দুই টাকা, একখারি মাছ (ছোট বড় এবং ২৫-৩০ সের ওজনের) ৩-৪ টাকা, এক সের দুধ ৩-৪ পয়সা, এক সের গরুর গোশত ১০ পয়সা, এক সের গাওয়া ঘি ১ টাকা চার আনা, ৪টা ডিম ৩ পয়সা, ১টা বড় মোরগ ৪-৫ আনা এবং অন্যান্য জিনিষ পত্রের দাম সেই তুলনায় খুব কমছিল।

চল্লিশ দশকের আগের এবং পরের কথা বলিতেছি। তখন আমাদের দেশের লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল। প্রত্যেকের ভিটা বাড়ীর চারদিকে অনেক পতিত জমি ছিল। প্রত্যেকের বাড়ীর আশে পাশে ফলের গাছ, বাঁশের বেতের ঝোপ, আসবাব পত্র তৈয়ারীর গাছ এবং পুকুর ডোবা ছিল। তবে সারা বছর ধরিয়া মহামারি দেখা যাইত। কলেরা-বসন্তের টিকা দিতে আসিলে অনেকে ভয়ে পালাইয়া যাইত। আস্তে আস্তে সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং বালা-মুসিবত নিপাত হইতে থাকে। টিউবওয়েলের পানি পান করিয়া রোগ প্রতিরোধের টিকা দিয়া এবং মশার কামড়ের প্রতিকার করিয়া অনেকে বিভিন্ন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিত।

www.pathagar.com

২

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং সেই সময়কার মন্বান্তরের কথা

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। আমি তখন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। কলিকাতা হইতে মওলানা আকরাম খানের দৈনিক আজাদ পত্রিকা ঢাকায় আসিত এবং একটি পত্রিকা আমাদের গ্রামের ইসহাক মুদি রাখিত। ইসহাক মিয়া সদ্যালাপি এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাহার দোকানের এক পাশে বসিয়া পত্রিকাটি পড়িতাম। আমি গ্রামের অন্য ১০ জন ছেলে হইতে আলাদা ধরণের ছিলাম। লেখাপড়াই ছিল আমার ধ্যান ধারণা। তাই ইসহাক মিয়া আমাকে খুব পছন্দ করিতেন। অনেক সময় আমার নিকট হইতে রাজনৈতিক এবং যুদ্ধের খবরাখবর জানিতেন। আমাদের স্কুলে দৈনিক পত্রিকা এবং সাময়িক পত্রিকা রাখিত। দাঁড়াইয়া পড়ার জন্য অফিসের সামনে খোলা জায়গায় কয়েকটি স্ট্যান্ড ছিল এবং সেখানে কোন কোন সময় মোটামুটি খবর দেখিতাম।

মহাযুদ্ধের চাপ সর্ব শ্রেণীর লোকের উপর পরিতে লাগিল। গরীবদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পরিল। সকল জিনিষের দাম, অগ্নিমূল্য এবং ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গেল। আয়ের তুলনায় ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। কারণ যুদ্ধের জন্য ইংরেজ শাসকরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মজুত করিতেছিল। বাঁচার চাহিদার তাগিদে লোকজন প্রথম জিনিষপত্র বিক্রয় করিল এবং পরে অনেকে ঘর ও ভিটা টুকুও বিক্রি করিল। ছিন্নমূলের সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইল। শহরে-বন্দরে ছিন্ন-মূল লোকদের দেখা যাইত। কঙ্কালসার লোকগুলি বাঁচার চাহিদায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পথে-ঘাটে মরিতে লাগিল। এই মৃত্যুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী দেখা দিল বাংলা ১৩৫০ সালে এবং ইংরেজী ১৯৪৩ সালে। ১৩৫০ সালের মৃত্যুগুলিকে মন্বন্তরের মৃত্যুরূপে ধরা হয়। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের ছবিগুলি আঁকিয়া শিল্পাচার্য্য জয়নুল আবেদিন সেইযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে পরিচিতি লাভ করেন। কথিত আছে বাংলাদেশে সেই সময় দশলক্ষ লোক খাওয়ার অভাবে মৃত্যুবরণ করে।

১৯৪৩ সালে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় অনেক ছাত্র স্কুলের পড়া ছাড়িয়া দেয়। আর বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন কাজে যোগদান করে। স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষক অর্ধেকে আসিয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় আমি নবম শ্রেণীতে ঢাকার গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলে ভর্তি হই।

www.pathagar.com

নবম এবং দশম শ্রেণী সেই স্কুলে পড়ি। এই স্কুলের নিয়মাবলী ছাত্রদের চরিত্র গঠণের সহায়ক ছিল। স্কুলের ব্যান্ডপার্টি ছিল, ছাত্ররাই সদস্য ছিল। প্রতিদিন ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে ব্যান্ডের তালে তালে পিটি হইত এবং লাইন লাগাইয়া দলে দলে করিয়া ছাত্ররা ক্লাশে ঢুকিত।

প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান সাহেব খুব দক্ষ পরিচালক ছিলেন। ছাত্রদের উপর পড়ার চাপ সর্বক্ষণ ছিল। যাহার ফলে বোর্ডের পরীক্ষায় ছাত্ররা ভালভাবে পাশ করিত।

www.pathagar.com

৩

ভারতবর্ষের বিভক্তি, মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা (১৯৪৪-১৯৪৬)

১৯৪৪-১৯৪৬ ভারত বর্ষের ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়। এই সময় মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন এবং কংগ্রেসের অবিভক্ত ভারত-বর্ষের আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা সর্ব ক্ষেত্রে পিছাইয়া ছিল। বিশেষ করিয়া শিক্ষায় মুসলমানরা অনেক বেশী পিছাইয়া ছিল। স্কুলে পড়ে এমন মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ১০-১৫ জনের বেশী ছিল না। আমাদের সময় ১৯৪৬ সালে ঢাকা বোর্ডে মুসলমান ছেলের পাশের সংখ্যা ছিল ৯৭ জন, হিন্দু মেয়েদের পাশের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন এবং ছেলেদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০০ জন। এই ফলাফল ঢাকার চাবুক পত্রিকায় ছাপানো হইয়াছিল।

মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ঈমান, একতা এবং শৃঙ্খলা। গোটা কতক ছাত্র এবং কিছু দরদী মানুষ মুসলমানদের আগাইয়া দিয়াছিল। প্রাদেশিক পরিষদের ভোটা-ভোটিতে প্রায় মাস খানেক কাজ করিয়া ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু করি। আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মুসলিম লীগ বাংলা প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসাবে বিজয়ী হয়। হোসেন শহীদ সরওয়ার্দি মুখ্যমন্ত্রী হন এবং মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুরা বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের উপর নিপীড়ন শুরু করে। যাহার ফলে বিহারে এবং কলিকাতায় হাজার হাজার মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়। ঢাকা শহরে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমি ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হই।

www.pathagar.com

৪

স্কুল জীবনের কিছু কথা

ছোট বেলা হইতেই ভাল মন্দ বিচারের শক্তি আল্লাহ্ তায়ালা আমার মধ্যে দিয়া ছিলেন। গ্রামে সমসাময়িক বয়সের ছেলেদের পড়াশুনার খুব একটা আগ্রহ দেখিতাম না। অমনোযোগী হওয়ায় পরীক্ষায় তাহারা ভাল করিতনা। অনেকের বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষক ছিল তথাপি পরীক্ষায় তাহারা নিম্নস্তরের নম্বর পাইত। কারণ তাহারা মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করিত না। অল্প বয়সে অর্থ পাইয়া চরিত্র গঠণে এবং পড়াশুনার কাজে মনোনিবেশ না করিয়া বিভিন্ন কুকর্মে লিপ্ত হইয়া পরিত।

কালিন্দী হাইস্কুল ১৯৩৫ সনে স্থাপিত হয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর থেকে আমিরাবাগ গ্রামের হাজি মোঃ ফয়েজ হোসেন স্কুলটির জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ডাঃ মইজদ্দিন আহমদ। তিনি ঢাকা শহরের ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কোন কোন সময় স্কুলের অনুষ্ঠানে সভাপতি সাহেবকে দেখা যাইত। স্কুলের জেনারেল সেক্রেটারী হাজি মোঃ ফয়েজ হোসেন সাহেব নিজের ব্যবসা স্থান ঢাকা শহরে যাওয়ার আগে স্কুলে যাইতেন এবং ঘুরিয়া দেখিতেন মাস্টারগণ ক্লাশ নিতেছেন কিনা। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। একদিন বাড়ী যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ীর নিকট আসিয়া আমাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার মেয়ের বিয়েতে যাইতে বলিলেন।

১৯৩৯ সনে ফাল্গুন মাসে বাংলা প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক আমাদের এলাকা পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি তখনকার রামের কান্দার মাদ্রাসার মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। ফেরার পথে সন্ধ্যার সময় কালিন্দী হাই স্কুলের মাঠে উপস্থিত হন। সেই সময় তাঁহাকে নিজ চোখে কাছাকাছি দেখিলাম। তখন ভোটের সময় ছিল এবং তিনি তাঁহার দলের লোকদেরকে ভোট দিতে বলিলেন। তখনকার দিনে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জীবনী হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখার ছিল। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ-তে (কলা শাখায়) ভর্তি হন। তিনি উকালতি পড়িবেন তাই কলা শাখায় ভর্তি হইয়াছিলেন। একবার তিনি ছুটির শেষে বরিশাল হইতে স্টীমার যোগে গোয়ালন্দ হইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। সেই স্টীমারে তাঁহার পরিচিত এক হিন্দু ভদ্র লোকের সাথে দেখা হয়। হিন্দু ভদ্রলোক কথায় কথায় বলিলেন মুসলমানদের মাথা দুর্বল, তাই বিজ্ঞান

www.pathagar.com

পড়ে না। এই কথা শুনিয়া হক সাহেব-এর মনে জিদ ধরিল এবং কলিকাতায় পৌছিয়া কলা শাখা হইতে পরিবর্তন করিয়া বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি অংকে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর "ল" পাশ করিয়া উকালতি শুরু করেন। এই মহাপুরুষের গুণাবলী আমাদের সেই যুগের মুসলমান ছাত্রদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করিয়াছে।

১৯৪৩ সালের মন্বান্তরের সময় স্কুল যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম তখন আমি ঢাকার গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেই এবং সিলেক্ট হই। আমি যখন টি, সি-র জন্য দরখাস্ত দেই হাজি সাহেব তখন অসুস্থ ছিলেন এবং আমাকে নিজ বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমাকে বুঝাইলেন যেন অন্য স্কুলে না যাই। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমার উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্খা আছে। এই বলিয়া আমি তাহার সহযোগিতা এবং দোয়া প্রার্থনা করিলাম।

তিনি টি, সি দেওয়ার আদেশ করিলেন। কিছু দিন পর তিনি হার্ট এটাকে মারা গেলেন। আমাদের এলাকায় হাজি মোঃ ফয়েজ হোসেন শিক্ষা প্রসারের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। আমার মতে তিনি এই এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত ছিলেন।

আমাদের আর্থিক অবস্থা মধ্যবিত্ত পরিবারের চলার মত ছিল। ছোট কাল হইতে অল্প খরচে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিয়া ছিলাম। আমি ছোটকাল হইতেই গোসলের সময় নিজের গায়ের কাপড়-চোপড় সাবান দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া দিতাম এবং গোসলের পর ধোয়া কাপড় পরিতাম। এখনও সেই অভ্যাস আছে। এখনও কেউ আমার কাপড় ধুইতে পারে না। ছোট কাল হইতে দাদি রান্না করিয়া খাওয়াইতেন। দাদি যখন বেশী বৃদ্ধা হইয়া পরিলেন সৎ মার উপর আমাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব পরিল। নবম এবং দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় সৎ মা আমার খাওয়ার ভার নেন।

আমাদের গ্রাম হইতে জগন্নাথ কলেজের পাশে গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের দূরত্ব প্রায় চার মাইল ছিল। প্রতিদিন হাঁটিয়া আসিতাম এবং ফিরিয়া যাইতাম। দৈনিক প্রায় ৭-৮ মাইল জায়গা হাটা হইত। ইহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই। পথে বাবুর বাজারের খেয়া নৌকায় বুড়ীগঙ্গা পারাপার হইতাম।

মুসলিম হাইস্কুলে ছাত্রদের টিফিনের সময় টিফিন দিত। আমরা মাসে বারো আনা মাসিক বেতনের সাথে জমা দিতাম। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন খাওয়া দিত। সচরাচর গজা, বিস্কুট, সিংগারা, কলা, কমলা ইত্যাদি। ঢাকার ইসলামপুর এলাকার এক বুড়ো পানি খাওয়াইত। বুড়োর বয়স ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রায় ৯০

www.pathagar.com

বছর ছিল। বেশ শক্ত ছিল। সে নাকি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরকে ছোট বেলার সময় দেখা শুনা করিত।

সে যুগে মুসলিম হাইস্কুলের ছেলেদের সুনাম ছিল। পাজামা, সার্ট, টুপি এবং জুতা পরিয়া স্কুলে যাইতাম। যোহর ওয়াক্তে জামায়াতে নামাজ হইত। অজুর বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের বেশ দরদ ছিল। যাহারা পড়ায় দুর্বল ছিল তাহাদের প্রতি শিক্ষকগণ বেশী নজর রাখিতেন। বোর্ডের পরীক্ষার আগে প্রায় দেড় দুই মাস অতিরিক্ত ক্লাশ নিতেন। ইহাতে পরীক্ষায় ফল অনেক ভাল হইত। আজকাল সেই দিনের শিক্ষকদেরকে খুঁজিয়া পাওয়া দুস্কর। শিক্ষকগন শিক্ষকতাকে ব্যবসায় পরিণত করিয়াছেন। সেই নীতি পরিহার করিয়া শিক্ষকদেরকে ধর্ম প্রচারকের মত ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমার পিতা আমাদের ব্যবসায়ে যোগদান করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যেন আমাকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেন। তিনি রাজি হইলেন এবং আমি ঢাকা কলেজে আই. এস. সি-তে জীববিদ্যা বিষয় সহ ভর্তি হইলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঢাকা কলেজ কয়েকটি বাড়ী নিয়া সিদ্দিক বাজারে ছিল এবং তিনটি বাড়ী নিয়া বেচারাম দেউরিতে ছাত্রাবাস ছিল। আমি নূরপুর ভিলায় থাকিতাম। দ্বিতীয় বর্ষে আমার রুমমেট ছিলেন এ. কে. এম আমিনুল হক সাহেব। বরং বলা উচিত ছিল আমি তাহার রুমমেট ছিলাম। কারণ তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পাঞ্জাব হইতে প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে এম. এস. সিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরবর্তীকালে নটিংহাম হইতে প্রাণীবিদ্যায় ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত হন। তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন এবং সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এখনও আমরা পরস্পরকে রুমমেট বলিয়া সম্বোধন করি। প্রফেসর এ. কে. এম. আমিনুল হক একজন পন্ডিত ব্যক্তি এবং ধার্মিক লোক।

www.pathagar.com

৫

ঢাকা কলেজে পড়ার সময় এবং ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রাক্কালে আমাদের দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছি (সময় জুলাই ১৯৪৬– আগস্ট ১৯৪৭)

আমি ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হই। ঢাকায় তখন সরকারী ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং বেসরকারী জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল। গ্রাজুয়েট স্কুলে রাত্রে মানবিক শাখায় সলিমুল্লাহ কলেজ শুরু হয়। জগন্নাথ কলেজে ঢাকা কলেজের প্রায় তিনগুণ ছাত্র-ছাত্রী ছিল। আর মেয়েদের জন্য ইডেন গার্লস ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল। ঢাকা কলেজ প্রথমে পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিং এ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেই বিল্ডিং এ মিলিটারীর ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে ঢাকা কলেজ সিদ্দিক বাজারে চারটি বাড়ী নিয়া স্থাপিত হয়। দারুসসালাম বাড়ীটিতে প্রায় ৪-৫ বিঘা জমি ছিল। এই বাড়ীর ভিতরে দুইটা দোতালা দালান, তিনটা এক তালা দালান এবং খোলা মাঠ ছিল। এখানেই প্রশাসনিক ব্লক, রসায়ন, পদার্থ এবং ভুগোল বিভাগ ছিল। বিজ্ঞান শাখার বড় ক্লাশগুলি এখানেই হইত। সব কয়টি বাড়ী নিয়া কলেজের দরকার অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল।

ঢাকা কলেজে তখন আসে পাশের জেলাগুলি হইতে অনেক মুসলমান ছাত্র আসিয়া ভর্তি হয়। ফলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অর্ধেকের বেশী হয়। অধ্যক্ষ ডঃ পি, রায়সহ অধিকাংশ অধ্যাপক হিন্দু ছিলেন। মুসলমান অধ্যাপকদের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ভাইস-প্রিন্সিপাল সুরত আলী সাহেব উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ঢাকায় বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইত এবং প্রতিটি দাঙ্গা হিন্দুদের দ্বারা শুরু হইত। সেইরূপ এক দাঙ্গায় বহিরাগত লোকেরা কলেজের ভিতর প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের উপর আক্রমন করে। মুসলমান প্রফেসারগণ এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র তাহাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু এর মধ্যে তাহারা অধ্যক্ষকে এবং ইতিহাসের অধ্যাপককে ছুরিঘাত করে। চিকিৎসার পর অধ্যক্ষ সুস্থ হয়ে উঠেন এবং ইতিহাসের অধ্যাপক নিহত হন। ইহার পর ঢাকা কলেজের হিন্দু ছাত্ররা অন্যত্র চলিয়া যায় এবং হিন্দু অধ্যাপকগণ বদলী হইয়া যান।

বেশ কিছুদিন পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। আস্তে আস্তে অন্যত্র হইতে মুসলমান অধ্যাপকগণ বদলী হইয়া আসেন এবং কয়েকজন অধ্যাপক পদে নতুন চাকুরীতে যোগদান করেন। অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম সাহেব কলিকাতা

www.pathagar.com

ইসলামিয়া কলেজ হইতে বদলী হইয়া আসেন এবং অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এই সময় অধ্যাপক মনসুরুদ্দিন বাংলা বিভাগের প্রধান হইয়া আসেন। এই দুর্দিনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব আমাদের অংকের ক্লাশ নিতেন। সেইরূপ মিটফোর্ড স্কুলের ডাঃ শামসুদ্দিন সাহেব প্রাণীবিদ্যার ক্লাশ নিতেন। আস্তে আস্তে কলেজের সকল বিভাগে মুসলমান অধ্যাপকদের দ্বারা নিয়মিত ক্লাশ চলিতে লাগিল।

১৯৪৭ সালে যখন ঢাকা কলেজে পড়ি তখন ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন হয়। আমি সেই সম্মেলনে যোগদান করি। জনাব আবুল মনসুর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি মুসলমানদের তখনকার অবস্থা বর্ণনা করেন। তাঁহার ভাষা এবং বলার ভঙ্গি সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। সেই সম্মেলনে জনাব আব্বাস উদ্দিন তদীয় কন্যা ফেরদৌসী বেগমকে সাথে লইয়া গান করেন। ফেরদৌসী বেগমের বয়স তখন ৮-১০ বছর ছিল এবং সালওয়ার ও ফ্রক পরা ছিল। তাহাদের যুগল কণ্ঠের একটি গান "ও বাজান চল্ চল্ যাই মাঠে লাঙ্গল বাইতে" আমি এখনো ভুলি নাই।

আমি আগেই বলিয়াছি আমাদের সময় হিন্দুগণ সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। বাংলা প্রদেশে হিন্দু মুসলমানের জন সংখ্যার অনুপাত ছিল ৪৮ঃ৫২। কিন্তু হিন্দুগণ শিক্ষায়, ব্যবসায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বেশী অগ্রগামী থাকায় চাকুরীতে প্রায় ৮০ ভাগ এবং ব্যবসায় প্রায় ৭০ ভাগ দখল করিয়া রাখিয়াছিল।

মুসলমানগণ শিক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিমলীগ অগ্রসর হইতে থাকে এবং বিভিন্ন সময় হিন্দুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং পাকিস্তানের দাবী এই সময় শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। হিন্দুদের আধিপত্য বিস্তার করার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের অবিভক্ত ভারত বর্ষের দাবীকে জোরদার করা। আর মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী ছিল মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তোলা। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠণ করিয়া নিজেদের শাসন কায়েম করা। কংগ্রেসের উগ্রপন্থি হিন্দুরা এবং হিন্দু মহাসভার লোকেরা সব সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাইয়া পাকিস্তানের দাবীকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে কলিকাতায় এবং বিহারের হাজার হাজার মুসলমান দাঙ্গায় নিহত হইয়াছে। আর লক্ষ লক্ষ লোক আহত এবং গৃহছাড়া হইয়াছে।

১৯৪৬ সালে ভোটাভোটিতে মুসলিমলীগ মুসলমানদের একমাত্র

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলরুপে চিহ্নিত হয় এবং লর্ড মাউন্ট বেটেনের ভারত বর্ষ বিভক্তির ফরমুলা মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দ মানিয়া নেয়। নূতন দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য "র‍্যাড ক্লিফ রোয়েদাদ" কমিশন গঠন করা হয়। সিলেটের লোকদের রেফারেনডাম গণভোটের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন দেশে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

১৮৪৭ সালে মে মাসে আমরা ঢাকা কলেজ হইতে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র সিলেটে পৌঁছি। সিলেটের আম্বরখানা ক্যাম্পে উপস্থিত হই এবং সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা হয়। তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হইতে একদল ছাত্রের সাথে আসিয়াছিলেন। আমাদেরকে হবিগঞ্জে পাঠানো হয়। আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বানিয়াচং, মারকুলি আজমিরিগঞ্জ, নাগুড়া, খাগুড়া এবং আরও কিছু এলাকায় কাজ করি। আমার দল নাগুড়া এলাকায় ১৫ দিন কাজ করে। সিলেটবাসীরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় এবং সিলেট পাকিস্তানের অংশ হইয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

www.pathagar.com

৬

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তানের দূরবস্থা, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আপামর জনতার অর্থনৈতিক মুক্তি ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিশ্রুতি নিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। নূতন রাষ্ট্রের প্রথম হইতে দেখা গেল উর্দূভাষীরা দেশের সর্বস্তরে চাকুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্য দখল করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা হিন্দুদের শাসন হইতে মুক্তি পাইবার আশায় পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠণ হইবার পর দেখা গেল বাঙ্গালীরা উর্দূভাষীদের অধীন।

নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিভিন্ন চাকুরীতে বাঙ্গালীরা যোগদান করিতে থাকে। প্রতিক্ষেত্রে তাহাদেরকে উর্দূভাষীদের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। নতুন রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা অবাঙ্গালীরা ভোগ করিতে শুরু করে। ইহাতে বাঙ্গালীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টা জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা সফরে আসেন। এটাই জিন্নাহ্ সাহেবের প্রথম এবং শেষ সফর। জিন্নাহ্ সাহেব ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বিকালে ঢাকার রেসকোর্সে (বর্তমান সরওয়ার্দী উদ্যানে) বক্তৃতা করেন। তাঁহার মঞ্চটি প্রায় ২০ ফুট উচু ছিল এবং সেইটা বর্তমান আর্ট কলেজের গেইট হইতে প্রায় ২০০ গজ পূর্বে ছিল। কয়েক লক্ষ লোক সেই জনসভায় উপস্থিত ছিল। আমি জিন্নাহ্ সাহেবের মঞ্চ হইতে প্রায় ৫০ গজ দক্ষিণে বসিয়াছিলাম এবং আমার আশে পাশে আরও অনেক ছাত্র বসিয়াছিল। জিন্নাহ্ সাহেব যেই মাত্র তাঁহার ভাষণে বলিলেন উর্দূ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হইবে তখনই উপস্থিত ছাত্ররা প্রতিবাদ করিল। তৎক্ষনাৎ একদল ছাত্র "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" দাবী করিয়া সেই সভা হইতে মিছিল করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

শেখ মুজিবর রহমান সাহেব তখন সেই মিছিলে ছিলেন এবং আমি নিজে সেই মিছিলের একজন ছিলাম। সেই মিছিলে প্রায় ৪০-৫০ জন ছাত্র যোগদান করিয়াছিল। অনেকে পুলিশের ভয়ে মিছিলে শামিল হয় নাই। আমি তখন আই, এস, সির ২য় বর্ষের ছাত্র।

প্রায় এক সপ্তাহ্ পর আমরা ঢাকা কলেজ হইতে মিছিল করিয়া ফজলুল হক হলে আসি। সেখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী করিয়া সভা হয়। সেই সভায় শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পকেটে দুইশত নাজিমুদ্দিন আছে। নাজিমুদ্দিন সাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীর পক্ষে মাঝে মাঝে মিছিল বাহির হইতে থাকে। এমনি

www.pathagar.com

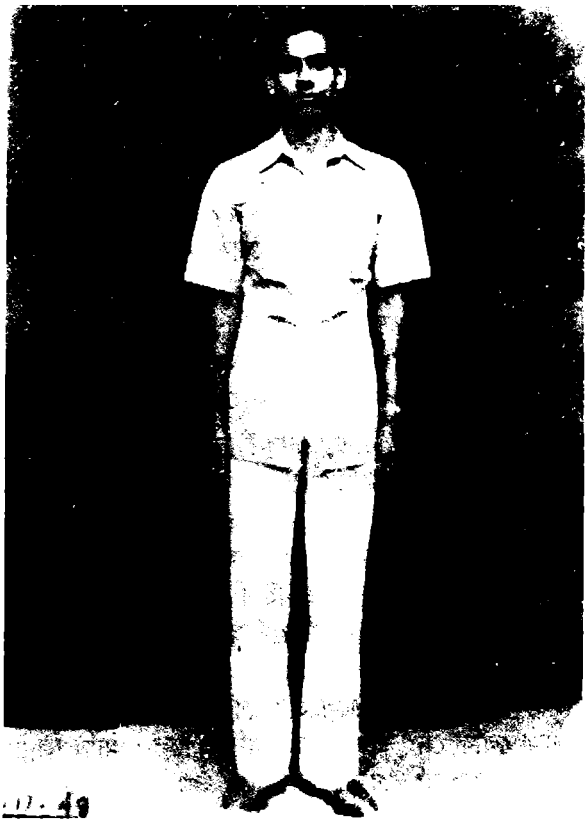

লেখকের ফটো- ৮.১১.৪৮

এক সভায় ঢাকা হলের সম্মুখে (বর্তমান শহীদুল্লাহ্ হল) ঢাকা কলেজের ইংরেজীর প্রভাষক জনাব ফরিদ আহমদ সরকারী চাকুরী হইতে ইস্তফা দেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবীর মিছিল বাহির হয় এবং জনাব ফরিদ আহমদ সেই মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এই মিছিল প্রথম প্রাদেশিক সচিবালয়ে যায় এবং সেখানে দিনাজপুর হইতে নির্বাচিত মন্ত্রী জনাব হাসান আলী সাহেবের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা মর্য্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করিবেন। সেখান হইতে আবদুল গনি রোডে পিরোজপুর হইতে নির্বাচিত মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আফজালের সাথে দেখা করি এবং তোপখানা রোডে খাদ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের বাসায় (বর্তমান প্রেস ক্লাবে) দেখা করি। এই দুই মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। এর পর অর্থ মন্ত্রী জনাব

www.pathagar.com

হামিদুল হক চৌধুরীর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহারের মিন্টু রোডের বাসায় গমন করি। এই মন্ত্রীদ্বয় আশ্বাস দিয়াছিলেন এই বলে যে তাহারা আমাদের দাবী কেন্দ্রের নিকট পেশ করিবেন। শেষে আমরা যাই বর্ধমান হাউসে মুখ্যমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিনের বাসায় (বর্তমান বাংলা একাডেমি)। নাজিমুদ্দিন সাহেব বাসায় ছিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সচিবের নিকট আমাদের স্মারক লিপি হস্তান্তর করি। আমাদের দাবী ছিল বাংলাকে উর্দূর সাথে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা আদায় করা। কিন্তু আমাদের এই দাবীর ব্যাপারে কেন্দ্রের সাথে কেউ আদায় করার মন নিয়া চেষ্টা করেন নাই। সবাই আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছিলেন।

আস্তে আস্তে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবী গণদাবীতে পরিণত হয়। প্রায়ই মিছিলে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হইত টিয়ার গ্যাস এবং লাঠি চার্জ দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হই। বর্তমান শহীদ মিনার এলাকায় আমাদের ছাত্রাবাস ছিল। জগন্নাথ হলের মিলনায়তন তখন প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে জড় হইত এবং মিছিল করিয়া রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই শ্লোগান দিয়া প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হইত এবং পুলিশের সাথে প্রায় সংঘর্ষ হইত। আমি প্রায় মিছিলে শরীক হইতাম। মাঝে মাঝে টিয়ার গ্যাসে চোখ জ্বালা করিত এবং দৌড়াইয়া চোখ ধুইতাম। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবী কোন রাজনৈতিক দলের দাবী ছিল না। কারণ তখন মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল কোন মেনিফেস্টো দিয়া মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মাঠে নামে নাই। এই দাবী ছিল সর্বস্তরের ছাত্রদের। কিছু কিছু সাধারণ মানুষ ছাত্রদের সাথে মিছিলে যোগ দিত কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল নগন্য।

রাষ্ট্র ভাষার দাবীর মিছিলে পুলিশ অনেককে লাঠি দিয়া পিটাইত এবং ধরিয়া নিয়া যাইত। জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকজন আইনজীবী ছাত্রদের মামলা তদবির করিতেন এই মামলাগুলি বিনা পারিশ্রমিকে করিতেন।

www.pathagar.com

৭

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের কথা

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী তুঙ্গে উঠে ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। সে সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের হোস্টেল বর্তমান বর্হিবিভাগ, নার্সেস হোষ্টেল এবং শহীদ মিনারের এক অংশ জুড়িয়া ছিল। মিলিটারী ব্যারাকের মত হোস্টেলের ব্যারাক ছিল এবং চারিদিকে তার কাটার বেড়া ছিল। হোস্টেলের ভিতর দিয়া একটি রাস্তা পূর্বদিক হইতে ঢুকিয়া পশ্চিম দিকে বকসী বাজার রোডে মিলিত ছিল। ব্যারাকগুলি এই রাস্তার দুই পাশে উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে ছিল। কাঠ, বাঁশ এবং বেড়ার ১৭টি ব্যারাক

মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ১৩ নম্বর ব্যারাকের সম্মুখে বাম হতে উপবিষ্ট মর্তুজা আলী, ইমদাদুল হক এবং মাহ্‌ফুজ হোসেন। দাঁড়ানো সিরাজজিন্নাত, সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মহিউদ্দিন খান, জহুরুল কামাল এবং আঃ রশিদ। তারিখ নভেম্বর ১৯৫০।

ছিল। ঘরের মেঝে এবং তিনফুট দেওয়াল পাকা ছিল। প্রতিটি ব্যারাকে ছয়টি কামড়া ছিল এবং প্রতি কামড়ায় তিনজন ছাত্র বাস করিত। কামড়াগুলির সম্মুখে প্রায় ছয় ফুট চওড়া বারান্দা ছিল। প্রত্যেক ব্যারাকের পাশে খোলা জায়গায়

www.pathagar.com

গোসল করার জন্য পানির কল ছিল এবং সেই জায়গাটুকু পাকা ছিল। দুই হইতে চারিটি ব্যারাকের জন্য একটি করিয়া পায়খানার ছোট ছোট ব্যারাক ছিল। এই পায়খানা ব্যারাকগুলিতে দুই দিকে চারটি করিয়া আটটি পায়খানা ছিল। ফিল্ড সিস্টেমের পায়খানা ড্রেনের সাহায্যে ময়লা সেপটিক ট্যাংকে চলিয়া যাইত। ছাত্রদের কমনরুম, ডাইনিং হল, কিচেন এবং ক্যান্টিন এইরূপ ব্যারাক এক জায়গায় ছিল। এই ব্যারাকগুলি ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে তৈয়ার হয়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ ১৯৫০ সালে ১০ কামড়ার তিনটি টিন সেড ব্যারাক তৈয়ার করা হয় এবং সেইগুলির নম্বর ছিল ১৮, ১৯ এবং ২০ ব্যারাক।

ব্যারাক নম্বর ১২ এবং ১৩ শহীদ মিনারের নীচে আছে। ১৮, ১৯ এবং ২০ নম্বর ব্যারাকের কিছু অংশ শহীদ মিনারের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আছে। আমি ১৩ নম্বর ব্যারাকের ২ নম্বর কামড়ায় থাকিতাম। প্রত্যেকের জন্য একটা করিয়া চেয়ার টেবিল এবং খাট ছিল।

ছাত্রবাসে প্রথম একটি মেস ছিল এবং ১৯৫০ সালে আরো তিনটি ব্যারাক বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো একটি মেস স্থাপিত হয়। মেস কমিটি এই মেসগুলিকে পরিচালিত করিত। মাসের প্রথম দিকে কাঁচা বাজার ডিউটি রোস্টার তৈয়ার করা হইত। প্রতিদিন একজন ছাত্র বাজারে যাইত। মেসের দুই বেলা খাওয়ার জন্য আমরা মাসের প্রথম দিকে প্রত্যেকে ৩৫ টাকা করিয়া জমা দিতাম। দুপুরে ভাত, ভাজি, মাছের তরকারী এবং ডাল দেওয়া হইত এবং রাত্রে মাছের জায়গায় মাংসের তরকারী দেওয়া হইত। কোন কোন সময় রাত্রে ভাতের জায়গায় চাপাতি রুটি দেওয়া হইত। রেশনে চাউলের সাথে কিছু গম পাওয়া যাইত। সেই গম ভাংগাইয়া আটা করা হইত এবং রুটি খাওয়ানো হইত। একজন ছাত্রের ১৩টি রুটি খাওয়ার রেকর্ড ছিল। তাই গম বিক্রি করিয়া চাউল কিনা হইত এবং রাত্রে ভাত দেওয়া হইত। প্রতি সপ্তাহের শেষের দিন একটি করিয়া সেমি ফিস্ট খাওয়ানো হইত। মাসের শেষের দিন গ্র্যান্ড ফিস্ট খাওয়ানো হইত। সেমিফিস্টে চারজনকে এক মুরগীর রোস্ট, খাসীর মাংসের তরকারী এবং পোলাও দেওয়া হইত। আর গ্র্যান্ড ফিস্টে প্রত্যেককে একটি মুরগীর রোস্ট, খাসীর মাংসের তরকারী, দৈ-মিস্টি এবং পোলাও দেওয়া হইত। এত কিছু খাওয়ার পর প্রতি মাসে জমা দেওয়া ৩৫/= টাকা হইতে ১-২ টাকা করিয়া ফেরত দেওয়া হইত। আমি মেস কমিটিতে কয়েক বছর জড়িত ছিলাম। আমাদের সময় অধিকাংশ ছাত্র নিজ কামড়ায় নাস্তা করিত। পাউরুটি, জ্যাম, মাখন ইত্যাদি খাইত। কিছু ছাত্র ক্যান্টিনে অথবা বাহিরে কুমিল্লার আলী মিয়ার হোটেলে এবং সিলেটের পপুলার হোটেলে নাস্তা করিত। খুব নগন্য সংখ্যক ছাত্র হোটেলে পুরা খাবার খাইত।

www.pathagar.com

৮

অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা

একুশে ফেব্রুয়ারী বলিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আমরা বুঝিয়া থাকি। আসলে একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু একুশ তারিখই নহে। একুশ তারিখ হইতে শুরু করিয়া তিন-চার দিন ধরিয়া যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, সব মিলিয়াই একুশে ফেব্রুয়ারী ঘটনা।

একুশে ফেব্রুয়ারী সকাল হইতে ছাত্ররা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে জমা হইতে থাকে। এখান হইতে মিছিল করিয়া জগন্নাথ হলে অবস্থিত প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে যাইয়া বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা মর্যাদার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই সময় আর্মড পুলিশ প্রাদেশিক পরিষদের চারিদিকে অবস্থান নেয়। আমি তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীর বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত আমার জরুরী বিভাগে ডিউটি ছিল। আমি ডিউটিতে যাইবার সাথে সাথে পুলিশের সহিত মিছিলকারীদের সংঘর্ষ বাঁধে। মিছিলকারীরা আগাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে পুলিশ বাঁধা দেয়। কাঁদুনে গ্যাস ছোঁরে এবং পরে রাইফেলের গুলি ছোঁরে। সংগে সংগে কিছু ছাত্র জখম নিয়া জরুরী বিভাগে আসে এবং কয়েক জন ছাত্র রোগী বহনকারী স্ট্রাচার নিতে আসে। মোঃ রফিককে মৃত্যু অবস্থায় প্রথম নিয়া আসে। তাহার কপালের মাঝ দিয়া একটি বুলেট বিদ্ধ হইয়া মাথার পিছন দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহার মাথার খুলি মগজসহ মাটিতে পরিয়া যায়। শুকনা ঘাস এবং মাটি ভরা মগজ মাথার খুলিতে রাখা অবস্থায় রফিকের লাশের পাশে স্ট্রাচারে করিয়া আনা হয়। আবুল বরকতকে দ্বিতীয় জখম ব্যক্তি হিসাবে স্ট্রাচারে করিয়া আনা হয়। একটি বুলেট তাহার বাম দিকের উরু ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ফলে তাহার বাম দিকের ফিমোরেল রক্তনালী দুইটি ফাটিয়া সজোরে রক্তপাত হইতে থাকে। প্রেসার ব্যান্ডেজ লাগাইয়া রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। সংগে সংগে অপারেশন থিয়েটারে পাঠানো হয়। সার্জারির প্রফেসার মেজর এলিনসন এফ,আর,সি,এস, বরকতের বাম পা কাটিয়া ফেলেন। কয়েক বোতল রক্ত দেওয়া হয় কিন্তু বরকত শেষ রাত্রে মারা যায়। অপারেশনের পর বরকতের জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। আবদুস সালামকে তৃতীয় জখম রোগী হিসাবে গ্রহণ করি। তাহার বামদিকের পেটের উপরে একটি গুলি বিদ্ধ হয়, তাহার এস্‌প্লিন জখম হয়। তাহাকে অপারেশন করেন ক্লিনিক্যাল সার্জারির প্রফেসার নোভাক সাহেব। এস-প্লেনেক্‌টমি করা হয়। সালাম একমাস পর মারা যায়। এলিনসন সাহেব ইংরেজ ছিলেন এবং নোভাক সাহেব জার্মান ছিলেন।

www.pathagar.com

২১শে ফেব্রুয়ারী সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা শহীদ মিনার তৈয়ারের কাজে লাগিয়া যায়। সেই জায়গায় শহীদ মিনারের তৈয়ার-এর কাজ শুরু হয় যে জায়গায় এই তিন যুবক গুলিবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই জায়গাটি ছিল ১২ নম্বর ব্যারাকের ৬ নম্বর কামড়ার দক্ষিণে এবং হোস্টেলের পূর্ব দিকের গেটের উত্তরে। মেডিক্যাল কলেজের বর্হিবিভাগে কিছু কাজ হইতে ছিল। ঠিকাদারের ইট, বালি এবং সিমেন্টের গুদাম নিকটেই ছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা কয়েকজন লেবারের সাহায্যে রাত ভরিয়া কাজ করে এবং সকালে শহীদ মিনার তৈয়ার সমাপ্ত করে। এখানে বলা প্রয়োজন মোঃ রফিক অছাত্র ছিল এবং তাহার বয়স প্রায় ২২-২৩ বছর ছিল। আবুল বরকত এম. এ. ক্লাশের ছাত্র ছিল এবং বয়স ২৩-২৪ বছর ছিল। আবদুস সালাম অছাত্র ছিল এবং বয়স প্রায় ২৪ বছর ছিল।

শহীদ মিনার তৈয়ারের সাথে মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্র নেতা ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল। তাহাদের মধ্যে ভি, পি, গোলাম মাওলা, প্রাক্তন জি, এস, ইঞ্জিনিয়ার সরফুদ্দিন, জি, এস, আবুল হাসেম, আলীম চৌধুরী, মোঃ জাহেদ, মোঃ রফিক এবং আরো অনেকে। গোলাম মাওলা সাহেব ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র এবং এম, এস, সি পাশ ছিলেন। ডাক্তারি পাশ করিয়া মাদারিপুর হইতে আওয়ামী লীগের টিকেটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং কিছু দিন পর হঠাৎ মারা যান। সরফুদ্দিন সাহেব একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ১৯৪৩-৪৭ পর্যন্ত রেলওয়ের লোকোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়া পাশ করেন এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম লগ্নে সৈয়দপুর ওয়ার্কসপে পোস্টিং হয়। সেখানে উর্দূ ভাষীদের সাথে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর বিরোধে চাকুরী ছাড়িয়া ১৯৪৮ সালে আমাদের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। পাশ করিয়া প্রথমে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন এবং দেড়-দুই বছর পর মিলিটারীতে যোগদান করেন। চাকুরী করিতে থাকেন এবং প্রাইভেট পড়িয়া ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ করেন। ১৯৭০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি,এস,সি পাশ করেন। আবার ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, বি পাশ করেন। তিনি কর্নেল পদবী পর্যন্ত লাভ করেন। আর্মি মেডিক্যাল কোরে চাকুরী শেষ করিয়া লিবিয়া সরকারের অধীনে কয়েক বছর সেখানকার হাসপাতালে চাকুরী করেন। লিবিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি শুরু করেন। বর্তমানে এডভোকেট হিসাবে প্র্যাকটিস করিতেছেন।

আলীম চৌধুরী আমাদের সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তীতে চক্ষুবিশেষজ্ঞ হিসাবে প্র্যাকটিস করিতেন। পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের কয়েকদিন আগে ডাঃ আলীম চৌধুরী অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে শহীদ হন। শহীদ মিনার প্রায়

www.pathagar.com

১৪-১৫ ফুট উচু ছিল। প্রায় ছয় বর্গফুট মেঝে ছিল এবং সেইটা দেড়-দুই ফুট উচু ছিল। সেই মেঝে হইতে একটি কলাম প্রায় চার বর্গফুট হইতে আস্তে আস্তে উপরের দিকে সরু হইয়া উঠে এবং প্রায় দেড় দুই বর্গফুট ব্যাসার্ধে যাইয়া শেষ হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল হইতে লোকজন শহীদ মিনার দেখিতে আসে। অনেকে শহীদ মিনারের মেঝেতে টাকা-পয়সা দিতে থাকে। এমনি একজন ২০-২২ বছরের মহিলা অশ্রুভরা চোখে কোলে এক শিশুকে নিয়া আসিয়াছিল এবং নিজের গলার হার খুলিয়া বেদীর উপর রাখিয়া গেল। সেই দিন ঢাকার সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বাঙ্গালী কর্মচারীরা অফিস এবং আদালত হইতে মিছিল করিয়া বাহির হইয়া আসে। মিছিলের ঢল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আসিয়া শেষ হয়। বেলা এগারটার সময় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা হয়। সেই জানাজায় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আরো অনেক সরকার বিরোধী নেতা ছিলেন। গায়েবানা জানাযা শেষ করিয়া ছাত্র জনতা মিছিল করিয়া প্রাদেশিক সচিবালয়ের দিকে যাইতে থাকে। পুরাতন হাই কোর্টের নিকট পৌঁছিলে পুলিশ বাঁধা দেয়। লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস এবং পরে গুলি ছোঁড়া হয়। হাই কোর্টের চৌরাস্তায় পুলিশের গুলিতে হাইকোর্টের কেরানী সফিকুর রহমান মারা যান। আমি সফিকুর রহমানের মরদেহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে দেখিয়াছি। ফর্সা এবং সুগঠন শরীরের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন তাহার স্ত্রী প্রথম অন্তঃসত্তা ছিলেন। সেইদিনই দুপুর বেলায় নবাবপুরের মানসী হলের সম্মুখে স্কুলের ছাত্রদের একটি মিছিলের উপর টহল মিলিটারী গাড়ী হইতে গুলি ছোঁড়া হয়। সেই জায়গায় সফিউল্লা নামে ১০-১২ বয়সের একটি ছাত্র গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যায়। তাহার লাশ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে দেখিয়াছি। বুকের পকেটে তাহার নিজ হাতে আঁকা প্রজাপতি সম্বলিত এক টুকরা কাগজ ছিল। সেই দিন ঢাকায় সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। রেডিও অফিস উর্দূ ভাষীদের দ্বারা রেকর্ডের সাহায্যে চলিতে ছিল। মিলিটারী বিভিন্ন জায়গায় টহল দিতে থাকে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভোর চারটার সময় আমরা ৮-১০ জন ছাত্র (দুই জন, দুইজন করিয়া) প্রত্যেককে একটি করিয়া সাইকেল নিয়া কারফিউকে অবজ্ঞা করিয়া শাহবাগ হইয়া ফার্মগেটের দিকে যাই এবং কৃষি কলেজের ফার্মের ভিতর দিয়া (বর্তমান মানিক মিয়া এভেনিউ) মিরপুর রোডে পৌছি। এই ছাত্রদলে আমিসহ মুন্সিগঞ্জের কাজী শাহজাহান হাফিজ এবং হামিদুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ফরিদুল হুদা এবং আরো ৩-৪ জন ছিল। উদ্দেশ্য ছিল রেডিও কর্মচারীদের বাঁধা প্রদান করা।

www.pathagar.com

যাহাতে মিরপুর যাইয়া ট্রান্সমিটার না খুলিতে পারে। কিছুক্ষণ পর একটি গাড়ী ঢাকা হইতে আসে। আমরা আগেই সাইকেলগুলি রাস্তার উপর রাখিয়াছিলাম। গাড়ী আসার সাথে সাথে তাহাদেরকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহারা ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক ছিল আমরা তাহাদের গাড়ীর চাকা ছিদ্র করিতে উদ্যত হওয়ায় তাহারা সবেগে গাড়ী চালাইয়া ঢাকার দিকে ফিরিয়া যায়। আমরা প্রায় এক ঘন্টার মত সেখানে ছিলাম। তাহারা নিশ্চয় আর্মড গার্ড লইয়া আসিবে এই ভাবিয়া ফিরিয়া আসি। সেই দিন ঢাকা রেডিও দেড় ঘন্টা পর শুরু হয়।

সেই দিন বিকালে পুলিশ এবং মিলিটারী শহীদ মিনার এলাকা ঘেরাও করে এবং মোটা দড়ির সাহায্যে টানিয়া শহীদ মিনার ভাংগিয়া ফেলে। নীচের অংশ টুকরা টুকরা করিয়া ভাংগিয়া ফেলে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমিন সাহেব। শহীদ মিনারকে ভাংগিয়া সেই সময়ের শাসকরা বাঙ্গালী জাতিকে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের সুযোগ করিয়া দিল।

www.pathagar.com

৯

আমাদের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক (ডিসেম্বর ১৯৪৮-নভেম্বর ১৯৫৫)

১৯৪৮ সনের জুন-জুলাই মাসে ঢাকা কলেজ হইতে আই, এস, সি পরীক্ষা দিয়া বসিয়াছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ,ও,টি,সি-তে যোগদান করি এবং মিলিটারী ট্রেনিং লইতে থাকি। ইহার পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত দেই। ডিসেম্বর মাসে টেস্ট পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ হয়। প্রায় দেড় হাজার প্রার্থীর মধ্যে ৯০ জন মনোনীত হয় এবং তাহাদের মধ্যে আমি স্থান পাই।

আর.পি. সাহাসহ ভারতেশ্বরী হোমে, তারিখ ২২.১.৫২

www.pathagar.com

এম.বি.বি.এস কোর্স প্রথম দুই বছর চারিটি বিষয় পড়ানো হইত যথা বি.এস.সি. পাশ কোর্সের কেমিষ্ট্রি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং এনাটমি। বর্তমানে ফিজিওলজি এবং এনাটমি পড়ানো হয়। পরবর্তী কোর্সের অন্যান্য বিষয়গুলি পূর্বের ন্যায় আছে। পরীক্ষার ধরণ খুব কঠিন ছিল। করাচির ডাঃ মাজহার ফার্মাকোলজীতে সমানে ফেল করাইতেন। সেইরূপ লাহোরের ডাঃ পীরজাদা মেডিসিনে ম্যাসাকার করিতেন। আমাদের নিজ কলেজের ডাঃ এম. এ. ওয়াহেদ, ডাঃ শামসুদ্দিন এবং ডাঃ আসির উদ্দিন কিছুটা কঠিনভাবে পরীক্ষা লইতেন।

কুমুদিনী হাসপাতালের সম্মুখে লেখক পিছনের সারিতে ডান দিকের শেষ প্রান্তে, তারিখ ২২.১.৫২

আমাদের সময় প্রফেসারগণ ক্লাশে এবং ওয়ার্ডে নিয়মিত পড়াইতেন। ওয়ার্ডে এবং বহির্বিভাগে যাইয়া নতুন রোগী দেখাইতেন। প্রত্যেকে নিয়মানুবর্তিতা পালন করিতেন। ছাত্ররা কোন প্রফেসরকে প্রভাম্বিত করিতে পারিত না। সব সময় ছাত্ররা ভয়ে ভয়ে চলিত। প্রফেসরগণ নিজ বাড়ীতে বিকালে ঘন্টা দুয়েক করিয়া প্রাইভেট রোগী দেখিতেন। ছাত্র সংসদের চাপ অধ্যক্ষ এবং প্রফেসরদের উপর ছিল না। বরং তাঁহারাই সব সময় ছাত্রদের উপর পড়ার চাপ দিয়া রাখিতেন। কোন কোন সময় আমরা ওয়ার্ড শেষ করিয়া গ্রুপ ফটো উঠাইতাম অথবা বাহিরে পিকনিক করিয়া আসিতাম। সেইরূপ একবার ডাঃ কর্ণেল গিয়াসউদ্দিন স্যারের ওয়ার্ড শেষ করিয়া তিন দিনের জন্য ২১-২৩

www.pathagar.com

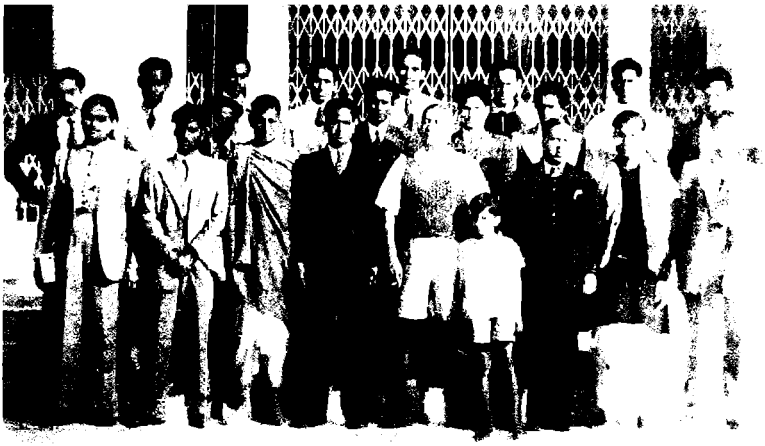

আর.পি. সাহার বাড়ীর মন্দিরের সম্মুখে লেখক পিছনের সারিতে বাম দিক হতে দ্বিতীয়, তারিখ ২২.১.৫২

আর.পি. সাহা তদীয় স্ত্রী, ছেলে এবং মেয়ের পক্ষের নাতনী। তারিখ ২২.১.৫২।

www.pathagar.com

জানুয়ারী ১৯৫২ সনে মির্জাপুরে আর-পি সাহার হাসপাতাল দেখিতে যাই। আমাদের সহপাঠী রুহুল আমিন এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখন কাঁচা রাস্তা দিয়া এবং মাঝে মাঝে নৌকার ফেরিতে গাড়ী পার করিয়া যাইতে হইত। রায় বাহাদুর আর-পি-সাহা আমাদেরকে খুব যত্ন সহকারে রাষ্ট্রীয় অতিথির মত সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন। ২২ জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে দুপুর বেলায় তাঁহার নিজ ঘরে হিন্দুপদ্ধতিতে ১৩ পদের খাদ্য দিয়া তাঁহার সহধর্মিনীর দ্বারা পরিবেশন করাইয়া ভোজন করাইয়াছেন। সেই আতিথ্যয়তা আজও ভুলি নাই।

১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বহির্বিভাগে প্রফেসর ডাঃ হুমাইয়া সাঈদের নেতৃত্বে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হয়। আমি সেই কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। প্রফেসর ডাঃ হুমাইয়া সাঈদ প্রসূতি এবং গাইনী বিভাগের ক্লিনিক্যাল প্রফেসার ছিলেন। তিনি ভারতের মাদ্রাজের অধিবাসী ছিলেন।

১৯৫৪ সনের নির্বাচনে হক-সরওয়ার্দি-ভাষানির যুক্ত ফ্রন্ট জয়ী হইবার পর শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠণ করেন। শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হইবার কয়েক দিনের মধ্যে বাঙ্গালী-উর্দুভাষীদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। বাংলাভাষী লোকেরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ভাবধারা নিয়া শাসন করিবে উর্দূভাষীরা সেইটা সহ্য করিতে পারে নাই। উর্দূ ভাষী অধ্যুষিত সেক্টারে এই দাঙ্গা বেশী প্রতিফলিত হয়। এই দাঙ্গা বিভিষিকা রূপ ধারণ করে নারায়ণগঞ্জের আদমজি জুট মিলে। সেখানে উর্দূভাষীরা বাংলাভাষীদের বিভিন্ন কলোনী কোয়াটারে বন্ধ করিয়া দেয় এবং অগ্নি ধরাইয়া দেয়। মারধর করিয়া যাহাদেরকে কাছে পাইয়াছিল তাহাদেরকেও সেই আগুনে পোড়ায়। আমরা ৭-৮ জন ছাত্র ৩-৪ টি এম্বুলেন্স নিয়া সেখানে উদ্ধার কাজে যাই। কিছু কিছু বাঙ্গালীদেরকে বিভিন্ন এলাকা হইতে উদ্ধার করি এবং বাঙ্গালী নিরাপদ জায়গায় পাঠাইয়া দেই। এখানে-সেখানে পোঁড়া লাশগুলি দেখা যাইতেছিল।

যেহেতু মেডিক্যাল কলেজের পড়াশুনা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌছিয়াছি এখানে ছাত্রাবস্তায় কিভাবে চলিয়াছি একটু বলা দরকার। পূর্বেই লিখিয়াছি আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের দলভুক্ত ছিলাম। বাবার যে আয় ছিল তাহা দিয়া মোটামুটি চলা যাইত। আয়ের তুলনায় পরিবারের ব্যয় বেশী ছিল। আমার পড়াশুনা সম্ভভপর হইয়াছিল কারণ আমার ব্যক্তিগত খরচ অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় অবিশ্বাস্য ভাবে কম ছিল। ছোট কাল হইতে স্বল্প খরচে নিজ হাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিলাম।

www.pathagar.com

১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ তারিখে গ্রুপ ফটো নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনের পর। ডাঃ মুঃ মাহ্‌ফুজ হোসেন পিছনের সারিতে বাম দিক হতে দ্বিতীয়

আসামে ১৯৫০ সনে বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন জোর ধরে। সেই সময় আমার বাবা দোকানপাট, জমি-জমা ফেলিয়া আসেন। আমাদের অবস্থা প্রায় পথেবসার মত হইয়া দাঁড়াইল। বাবা বরিশাল শহরে অল্প পুজিতে একটি দোকান লইয়া বৃদ্ধ বয়সে ব্যবসা শুরু করেন। সেই ব্যবসা হইতে যে আয় হইত তাহাতে পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া আমার খরচ দেওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পরিল। এঅবস্থায় আমি চতুর্থ বৎসরে পড়ার সময় পড়া চালাইয়া যাওয়ার জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য লইয়া বিবাহ্ করি। সেই অর্থ আমার নিজের খরচের জন্য ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে রাখি। সেই অর্থ দিয়া বাকী পড়া শেষ করি। ১৯৫৫ সনের নভেম্বরের ব্যাচে এম.বি.বি.এস পাশ করি এবং কর্মজীবনে পদার্পন করি।

www.pathagar.com

১০

সেই যুগে ডাক্তারি পাশ করার পর চাকুরীর অবস্থা (নভেম্বর ১৯৫৫ –ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭)

আমি আগেই বলিয়াছি আমাদের সময় মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। আমাদের ব্যাচে ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসের ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় এবং পরে আরো ৬০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। মোট ১৫০ জনের মধ্যে ৭ জন ছাত্রী ছিল। একবারে নিয়মিত পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসে মাত্র ১৫ জন। চাকুরী ছিল না। অনেকেই অনারারী হাউস জব করিত এবং চাকুরীর জন্য অপেক্ষায় থাকিত। আমিও বিনা পারিশ্রমিকে হাউস জব শুরু করি এবং চকবাজার এলাকায় এক ফার্মেসীতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করি। তখন মেডিক্যাল সার্ভিস এবং হেলথ সার্ভিস আলাদা আলাদা চাকুরী ছিল। মেডিক্যাল সার্ভিসের চাকুরী বিভিন্ন হাসপাতালে, ডিসপেনসারিতে, মেডিক্যাল স্কুলে এবং কলেজে ছিল। আর হেলথ সার্ভিসের চাকুরী ছিল রোগ প্রতিরোধক বিভাগে। হেলথ সার্ভিসের চাকুরীতে অনেকে যোগদান করিত না। সেই সময় ফার্মেসীতে রোগী দেখিলে ফিস দেওয়া হইত না। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনে ডিসপেনসারিতে যে ঔষধ তৈয়ার হইত তাহার মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ ডাক্তারকে মাস শেষ হইবার পর দেওয়া হইত। বাহিরে রোগী দেখিলে দূরত্ব বুঝিয়া ৩-৫ টাকা ফিস দেওয়া হইত। মেডিক্যাল সার্ভিসের চাকুরীর প্রথমে মাসিক বেতন ২২৫.০০ টাকায় শুরু হইত। আমার প্র্যাকটিস ভালই হইত। প্রথম মাসে প্রায় ২০০.০০ টাকা পাই এবং প্রতি মাসে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পনের মাস পর শেষের মাসে ৫৫০.০০ টাকা উপার্জন করি।

আর্মি মেডিক্যাল কোরে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত দেই। সেখানে খুব কঠিন প্রশ্নের সম্মুখিন হইতে হইয়াছিল। অনেকে নিয়মিত একবারে পাশ করিয়াও বাদ পরিয়া যায়। আল্লাহর রহমতে আমি চাকুরীতে যোগদানের পত্র পাই এবং ২৩-২-১৯৫৭ তারিখে ঢাকা সেনানিবাসে যোগদান করি। চাকুরীতে যোগদানের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করিতে যাই এবং সেই দিন অধ্যাপিকা ডাঃ হুমাইরা সাঈদের লাশ হাসপাতালে আনা হয়। তিনি টক্সিমিয়া অফ প্রেগ্‌নেনসী ও হিপাটাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

১১

মিলিটারী চাকুরীতে কর্মব্যস্ততা এবং স্মরণীয় ঘটনাবলী

(ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ – জুন ১৯৭০)

আমি আগেই বলিয়াছি ২৩-২-৫৭ তারিখে আর্মি মেডিক্যাল কোরে যোগদান করি। ২৫-২-৫৭ তারিখে বিকালে বিমান যোগে ট্রেনিং এর জন্য লাহোর হইয়া এবোটাবাদ রওয়ানা হই। সন্ধ্যার পর লাহোরে আমাদের বিমান অবতরণ করে। সেখান হইতে ট্রেনে রাওয়ালপিন্ডি ও ট্যাক্সিলা হইয়া হেভেলিয়ন যাইতে হইবে। আমার সাথে ডাঃ আবুল হোসেন ছিল। আমরা একত্রে রওয়ানা হই। লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনে নৈশ খাবার শেষ করিয়া রাত ১০টায় ট্রেনে যাত্রা শুরু করি।

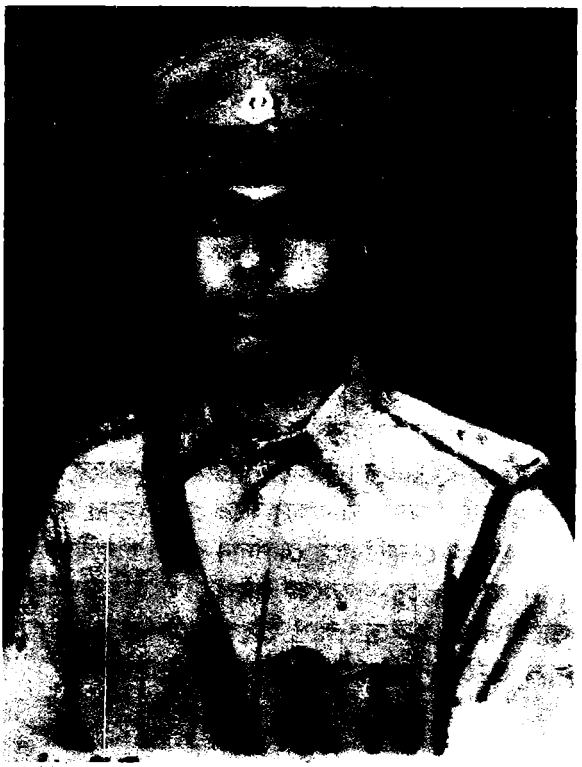

লেখক এবোটাবাদে সামরিক পোষাকে তারিখ ২.৪.৫৭।

www.pathagar.com

খুব ভোরে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছি এবং প্রায় সকাল ৮টায় ট্যাক্সিলায় পৌঁছি। লাহোরে পৌছিয়া বুঝিতে পারিলাম আমার হালকা কাপড়ের সুট সেখানকার শীতের জন্য যথেষ্ট নয়। ট্যাক্সিলায় পৌছিয়া নিকটের পুরো কির্তিগুলি দেখিলাম। ট্যাক্সিলায় অনেক পুরো কির্তি আছে এবং আন্তর্জাতিক মানের পুরো কির্তির যাদুঘর আছে। এখানেই বিশ্ব বিজয়ী গ্রীসের সম্রাট আলেকজান্ডার তক্ষশিলার রাজা পুরুর মুখোমুখি হইয়ছিলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর মহারাজা পুরু আলেকজান্ডারের এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজার নিকট হইতে রাজার মত ব্যবহার আশা করেন। আলেকজান্ডার সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বন্ধুরূপে বরণ করিয়াছিল। ট্যাক্সিলায় ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈনিকের সাথে দেখা হয়। আমাদের ট্রেন দুপুর ১২-০০ টায় হেলিলিয়ন পৌছে। চারিদিকে উঁচু পাহাড় এবং চূড়ায় বরফ জমা ছিল। আমাদেরকে নেওয়ার জন্য গাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। পাহাড়ের গা ঘেসিয়া চার হাজার ফুট উপরে এবোটাবাদের দিকে যাইতে লাগিলাম। সেখানে আরো বেশী ঠান্ডা কাগন ভ্যালির বরফে ঢাকা পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। প্রত্যেকটি কামড়ায় আঙ্গিঠায় পাথুরি কয়লা জ্বলিতেছিল। পানির লাইনে গরম পানির বন্দোবস্ত ছিল। দুপুরে মেসে যাইয়া আহার শেষ করি।

এবোটাবাদে ট্রেনিং সেন্টারে লেখক প্রথম সারিতে ডান দিক হতে তৃতীয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৫৭

আমাদের পৌছাইবার তিনদিন আগে ট্রেনিং শুরু হইয়াছিল। দুপুরে খাওয়ার পর অন্যান্য ট্রেনিং ডাক্তারদের সাথে দেখা হইল। আমাদের দুইজনকে

www.pathagar.com

নিয়া বাঙ্গালী ৭ জন ডাক্তার হইলাম এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আরো ৭ জন ডাক্তার ছিল। এ্যাবটাবাদ পৌছিবার পর মিলিটারী কাপড় চোপড় পাইতে লাগিলাম এবং নিজে একজোড়া গরম সুট তৈয়ার করিলাম। মিলিটারী ইউনিফরমে ফটো উঠাইলাম।

ভোর হইতে ট্রেনিং শুরু হইত। ভোরে পৌনে এক ঘন্টা পিটি এবং সেন্টারে ট্রেনিং দুইটা পর্যন্ত চলিত। বিকালে খেলাধূলায় যোগ দিতাম। রাত্রে মেসকাস্টমস-এর ক্লাশ হইত। ছয় সপ্তাহ এই ভাবে বেসিক ট্রেনিং শেষ হইল। তখন এবোটাবাদে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল। সেখানে বাঙ্গালী অফিসার লেফ্‌টেনেন্ট দোস্তগিরকে দেখিতে পাই। এরপর রাওয়ালপিন্ডিতে চলিয়া যাই। সেখানে চার সপ্তাহ ফিল্ড এম্বুলেন্সের ট্রেনিং এবং ছয় সপ্তাহ আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের প্রফেশনাল ট্রেনিং হয়। প্রতিটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ করার পর পরীক্ষা হইত এবং গ্রেডিং দেওয়া হইত। ট্রেনিং শেষ করিয়া চার মাস পর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট সেনা নিবাসে ২৪-৬-৫৭ তারিখে ১১ ফিল্ড এম্বুলেন্সে চাকুরীতে যোগদান করি।

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ রাওলপিন্ডিতে ট্রেনিং শেষে উঠানো ফটো। লেখক দাড়ান প্রথম সারিতে বাম হতে চতুর্থ। তারিখ ১৫.৬.১৯৫৭।

www.pathagar.com

১২

সামরিক চাকুরীর প্রথম কর্মক্ষেত্র।
কোহাট সেনানিবাস

চার মাস সামরিক ট্রেনিং শেষ করিয়া কোহাট সেনানিবাসে আমার প্রথম কর্ম জীবন শুরু হয়। সেখানে প্রায় আড়াই বছর চাকুরী করি (২৪ জুন ১৯৫৭-২১ অক্টোবর ১৯৫৯)। কোহাট শহর এই জেলার সদর। রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদ হইতে কোহাট পশ্চিমে ২০৫ মাইল দূরে অবস্থিত। পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী জেলা ক্যাম্বেলপুরের পরেই কোহাট জেলা। এই দুই জেলার সীমান্ত ঘেষিয়া সিন্ধু নদী প্রবাহিত হইতেছে। কোহাট রাওয়ালপিন্ডি রোড এবং রেল লাইন এই নদীর উপর দিয়া দুই দিকের পাহাড়ের গাঁ ঘেষিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অন্য দিকে কোহাট পেশোয়ার হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই দুই এলাকার মাঝেই দারা উপজাতীয় এলাকা। যেখানে আগ্নেয় অস্ত্রের শত শত কারখানা আছে। সেখানে আগ্নেয় অস্ত্র সাধারণ পণ্যের মত বিক্রি হয়। সেখান হইতে লাইসেন্স ব্যতীত কোন অস্ত্র পাকিস্তানের ভিতর আনা যায় না।

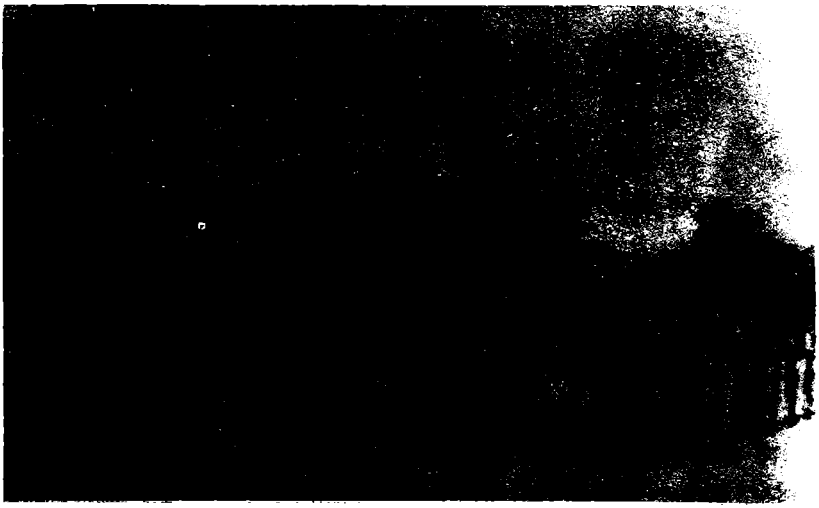

কোহাট ১১ ফিল্ড এম্বুলেন্সে ডি. এম. এস. মেজর জেনারেল আকরামের সিরিমোনিয়াল প্যারেডে লেখক প্যারেডের অগ্রভাবে। তারিখ ১.৬.৫৯।

আমি ১১ ফিল্ড এম্বুলেন্সে চাকুরী করিতাম। কোহাটে একটি বিগ্রেড ছিল। সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং এয়ার ফোর্সের রিক্রুটস ট্রেনিং সেন্টার ছিল।

www.pathagar.com

ও,টি,এস নামে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল ছিল। সেখান হইতে সর্ট কোর্সে গ্র্যাজুয়েট ক্যাডেটদের কমিশনড দেওয়া হইত। আমি যখন কোহাটে চাকুরী করি তখন মেজর জেনারেল এন, চিস্তি, সংসদ সদস্য কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী এবং ঢাকার প্রাক্তন মেয়র এবং সংসদ সদস্য কর্ণেল (অবঃ) মালেক ১৯৫৮-৫৯ সনে সেখান হইতে কমিশনড লাভ করেন। প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান এইচ এম, এরশাদ এবং তাঁহার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জোহা সেখান হইতে কমিশনড লাভ করেন।

স্কুল ফেরত পাঠান শিশুরা কাহাট ফোর্টের সম্মুখে তারিখ ১৬.৬.৫৮।

সামরিক চাকুরী ছাড়া আমি কোহাটে সিভিলিয়ান কাজেও নিয়োজিত ছিলাম। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ডিসপেনসারির মেডিক্যাল অফিসার ছিলাম এবং ষ্টেশন হেলফ অরগেনিজেশনের ইনচার্জ ছিলাম। সেখানে সিভিলিয়ান স্টাফ প্রায় ৪৫-৫০ জন ছিল। ম্যালেরিয়া সিজনে আরো লোক বৃদ্ধি করা হইত এবং ৭৫-৮০ জন লোক হইত। মাঝে মাঝে সিভিলিয়ানদের কাজ পরিদর্শন করিতাম। যাহার ফলে কোহাটের প্রায় এলাকা আমার জানা ছিল। মাঝে মাঝে আমার অফিস পিওন গোলাম হোসেন ডোভা নামক জায়গা হইতে বড় বড় পাপতা মাছ এবং মাহশের মাছ ধরিয়া আনিত। মাহশের মাছ আমাদের দেশের নলামাছের মত। ডোভা হইতে তিন-চার মাইল দূরে বাবৃড়ি-বান্ডা গ্রামছিল। এই গ্রামে লেঃ জেনারেল ইউসুফ খানের জন্ম। তিনি অনেক বছর রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাহার ছোট ভাই কর্নেল আফ্রিদি একজন ডাক্তার ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চাকুরী

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সার্জেন জেনারেল ছিলেন এবং আমাদের সময় কিছু দিনের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কোহাটের পাহাড়গুলি হইতে দুইটা ঝর্ণা সরু খালের সাহায্যে সেনানিবাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ করিত। এই ঝর্ণা হইতে পাইপ লাগাইয়া পানি রিজার্ভ ট্যাংকে নেওয়া হইত এবং সেখান হইতে সেনানিবাস এলাকায় সরবরাহ করা হইত।

ডিসপেনসারিতে চারটি বেড ছিল এবং পাঠানদের চিকিৎসা করিয়া রোগ মুক্ত করিলে খুশী হইয়া রোগির আত্মীয় স্বজনরা অনেক সময় আঙ্গুর, সারদা এবং খাচাভর্তি বাটেরা পাখী নিয়া আসিত। বাটেরা সেখানকার শিকারী পাখী। চড়ুই পাখী হইতে একটু বড়।

কোহাট এলাকায় শীতকালে চারিদিকের পাহাড়গুলিতে বরফ জমিত। আবার গরমের দিনে খুব গরম পরিত। কোন কোন সময় ১১৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠিত। ১৯৫৯ সনে গরমের দিনে একবার আমার হিট একজশন হইয়াছিল।

একবার ৩০-৪০ টি ট্রেনিং গাড়ীর বহর লইয়া হাঙ্গু এলাকায় যাই। সেখানে উপজাতীয় তিরা এলাকার সীমান্তে পৌছিয়াছিলাম। গাড়ীর বহর রাস্তার পাশে রাখিয়া আমরা এক ফলের বাগানে ঢুকিয়াছিলাম। বাগানটি প্রায় আধ মাইল লম্বা এবং পোয়া মাইল পাশে ছিল। পাহাড় হইতে ঝর্ণা নিচে নামিয়া আসার পর সেই বাগানের ভিতর দিয়া ঝর্ণাটি প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বাগানের ভিতর ভাগ ভাগ করিয়া পেয়ারা, আলুচা, খোরমানি, সেপ এবং আরো বিভিন্ন ফলের গাছ ছিল। পাহাড়াদাররা আমাদেরকে নিজের ইচ্ছামত ফল পারিয়া খাইতে বলিলেন, সেই ফলের কোন মূল্য দিতে হইবে না। অনেকে কিছু কিছু করিয়া ফল খাইলাম। পরে বাগান হইতে বিভিন্ন ফল কিনিয়া লইলাম । প্রতি পাঁচসের ফলের জন্য এক টাকা হইতে এক টাকা চার আনা করিয়া পরিশোধ করিলাম। সেই বাগানটি কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার মেজর জেনারেল জামালদার খানের ছিল।

আমার সহযোগী পাঠান সুবেদার খামিন শাহ পাহাড়ের উপরে তাহার এক আত্মীয়ের বাসায় আমাকে লইয়া যায়। সেই বাড়ীর পাঠান ভদ্রলোক আমাদেরকে নানা রকম ফল এবং সবুজ চা পরিবেশন করিয়াছিলেন।

একবার পেশোয়ারের অদূরে আটক ভ্যালীতে জি, এইচ, কিউ এক্সারসাইজে আমি এ, ডি, এস লইয়া গমন করি। সেই সময় ছিল ১৯৫৯ সনের

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর মাস। আটক হইতে মানকি শরীফ হইয়া পেশোয়ারে সেই মিলিটারী এক্সারসাইজ শেষ হয়। প্রায় এক সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। তৃতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেই এক্সারসাইজে পেশোয়ার হইতে আসিয়া যোগদান করে। একদিন রাত্রে আমরা এক নালার ধারে ক্যাম্প করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। সন্ধ্যায় কিছু বৃষ্টির আভাস ছিল কিন্তু সেখানে কোন বৃষ্টি হয় নাই। শেষ রাত্রে দেখিতে পাইলাম আমার টেন্টে ক্যাম্প কটের নীচ দিয়া পানির স্রোত যাইতেছে। পাহাড়ি এলাকা চেরাটে যে বৃষ্টি হইয়াছিল সেই বৃষ্টির পানি গড়াইয়া নামিতে ছিল। আমরা তৎক্ষনাত উচু জায়গায় সরিয়া গেলাম। সেই এক্সারসাইজে তৃতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ মীর শওকত আলী এবং ক্যাপ্টেন কে, এম শফিউল্লাহকে দেখিতে পাইলাম। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম চৌধুরীর সাথেও দেখা হইল। সে কবির চৌধুরীর এবং শহীদ বুদ্দিজীবি মুনীর চৌধুরীর ছোট ভাই ছিল। এরপর আমার সি,এম,এইচ চট্টগ্রামে পোস্টিং হয়। ২১-১০-৫৯ তারিখে সেখানে চাকুরীতে যোগদান করি।

www.pathagar.com

১৩

চট্টগ্রামে সেনানিবাসের কর্মজীবন।

সি,এম,এইচ চট্টগ্রামে এক বছর চাকুরী করি (২১শে অক্টোবর ১৯৫৯-১৪ই নভেম্বর ১৯৬০)। এই এক বছর যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যে কাটাইয়াছিলাম। খেলা ধূলায় খুব জোড় দেওয়া হয়। আমাদের "সফট বল" টিম চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারকে হারাইয়াছিল। সংস্কৃতি অঙ্গনেও আমরা সুনাম অর্জন করি। আমার পরিচালনায় উর্দু নাটক মোহাম্মদ-বিন্-কাসেম, নাচ-গান প্রভৃতি ২১-২-৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। দর্শকদের অভিমত ছিল এর আগে এত সুন্দর প্রোগ্রাম চট্টগ্রাম সেনানিবাসে হয় নাই। এই সব সম্ভবপর হইয়াছিল উর্দুভাষী হাবিলদার হাসেম এবং তার দল এবং বাংলাভাষী হাবিলদার হাবিবুর রহমান এবং তাহার নাচের দলের জন্য। হাসেম রেডিও প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করিত এবং হাবিবুর রহমান নাচের ওস্তাদ ছিল। এই সমস্ত বিনোদন কাজ মিলিটারী চাকুরীর ব্যস্ততার মধ্যেও করা যাইত। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিল লেঃ জেনারেল আজম খান। গভর্নরের আদেশে চট্টগ্রামে আমরা খাদ্যে ভেজাল নিরূপনের জন্য পরিদর্শন টিম গঠন করি। সি,এম,এইচ চট্টগ্রামের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল আলতাফ হোসেন সেই টিমের সভাপতি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। আমি এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ক্যাপ্টেন রউফ (পরবর্তী কালে ব্রিগেডিয়ার রউফ) সদস্য রূপে কাজ করি। বিভিন্ন সরিষা তেলের কারখানা, পাঞ্জা বনস্পতি কারখানা এবং চাউলের গুদামগুলি পরিদর্শন করি।

গনি অয়েল মিলে (বায়েজিদ বোস্তাম মাজারের নিকট) হোয়াইট অয়েলে গুড়া গোল মরিচ মিশাইয়া সরিষার তেলের রং তৈয়ার করা হইত এবং প্রতি টিনে ৪-৫ ফোটা এসেন্স অব মাস্টার্ড অয়েল মিশাইয়া সরিষা তেলের গন্ধ তৈয়ার করা হইত। সেইরূপ পাঞ্জা বনস্পতি কারখানায় পাঞ্জাবের তারামিরা বীজের তেল ফারনেসে ফুটাইয়া তলানী নীচে জমিয়া তেলের রং হালকা হইত এবং সরিষার তেলরূপে টিনে ভর্তি করিয়া বাজারজাত করা হইত। আরো অনেক ধরণের ভেজাল ধরা হইল। জাহাজ হইতে চাউল এবং গম নামাইয়া সরকারী গুদাম গুলিতে রাখা হইত। সুইপিং করা চাউল এবং গম ধূলা-বালি মিশানো অবস্থায় বস্তায় ভরা হইত এবং প্রতি ১০ বস্তায় ২ বস্তা করিয়া ধূলা-বালি মিশানো চাউল এবং গম রেশনের দোকানে দেওয়া হইত। সেই বস্তাগুলি সরকারী খাতা হইতে নষ্ট চাউল এবং গম বলিয়া বাদ দেওয়া হইত। সেগুলির পরিবর্তে ভাল বস্তার

www.pathagar.com

চাউল এবং গম বাজারে বিক্রি করিত। এই সমস্ত কাজ করিতে বেশ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অনেক সময় হাসপাতালের কাজ শেষ করিয়া বিকালে যাইয়া পরিদর্শন করিয়াছি। আমাদের রিপোর্ট যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছি কিন্তু মোকদ্দমাগুলি সিভিল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করানোর ফলে খুব একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় নাই।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে এক তদন্তে আমাকে নিয়োগ করা হয়। খোজ করিয়া দেখিলাম সব চেয়ে বড় রেডিওটি অধ্যক্ষের বাসায় ব্যবহার হইতেছে। কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের হিসাবে অনেক গড়মিল ছিল সেইগুলি সংশোধন করিয়া সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলার সাহায্য করিয়াছি।

সি. এম. এইচ চট্টগ্রাম হইতে আমার বদলী হয় সি. এম. এইচ ঢাকায়। আমি যে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে পরিবার লইয়া চট্টগ্রামে বাস করিতাম সেই বাসা ক্যাপ্টেন এইচ. এম এরশাদকে দেওয়া হয় (প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান এইচ. এম. এরশাদ)। আমার ঘরের চাবি প্রায় রাত ৯ টায় ১৪ই নভেম্বর ১৯৬০ তারিখে তাঁহাকে বুঝিয়ে দেই এবং মিলিটারী গাড়ীতে চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশন অভিমুখে রওয়ানা হই।

www.pathagar.com

১৪

ঢাকা সেনানিবাসে আমার কর্মজীবন।

সি. এম. এইচ ঢাকায় ১৫ই নভেম্বর ১৯৬০ তারিখে যোগদান করি। প্রথমে আমাকে সার্জিকেল ওয়ার্ডে ডিউটি দেওয়া হয়। কিছুদিন পর এম. আই, রুমে ডিউটি করি। এরপর আমাকে জি. এইচ. কিউ রাওয়ালপিন্ডির আদেশ অনুযায়ী ২৬শে এপ্রিল ১৯৬১ তারিখ হইতে স্টাফ সার্জেনের ডিউটি দেওয়া হয়। আমার পূর্বসুরিরা বেশ বদনাম লইয়া সরিয়া গিয়াছেন। ঢাকা সেনা নিবাসের অফিসার্স এবং তাঁহাদের পরিবারের চিকিৎসা করা স্টাফ সার্জেনের কাজ। অনেকের বাসায় কল দিলে যাইতে হইত। অনেক সময় মাঝ রাত্রে এবং শেষ রাত্রে কল আসিয়াছে এবং বাসায় যাইয়া রোগী দেখিয়াছি। এমনি একদিন শেষ রাত্রে জরুরী কল আসে। সি. এম. এইচ হইতে জীপ ডাকিয়া আনি। মেজর জি. এস. এস আহম্মদ কে তাহার বাসায় দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া যখন বাসায় ফিরি তখন অফিসের সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তাই সেই জীপ বাসায় রাখিয়া নাস্তা করিয়া জীপে করিয়া অফিসে যাই। ষ্টেশন এডম অফিসার আমাকে জীপে করিয়া অফিসে যাইতে দেখিয়াছিলেন এবং সেই দিন ১৪ ডিভিশনে আমার বিরুদ্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমাকে লিখিত জবাব দিতে হইয়াছিল। আমার জবাব পড়িয়া তখনকার ডীভ কমান্ডার মেজর জেনারেল খাজা ওয়াসি উদ্দিন স্টাফ সার্জেনকে একটা স্টাফ কার দেওয়ার আদেশ ইস্যু করিলেন। স্টাফ সার্জেন দরকার মনে করিলে গাড়ী ড্রাইভার সহ নিজ বাসায় রাখিতে পারিবে এবং দরকার মত জরুরী কলে রোগীদের বাসায় যাইয়া দেখিবে। আমি অবশ্য সেই কার নিজের বাসায় কোন সময় রাখি নাই। দরকার হইলে সি. এম. এইচ এ টেলিফোন করিতাম এবং স্টাফ কার বাসায় চলিয়া আসিত। আমি স্টাফ সার্জেনের ডিউটি খুব সুনামের সাথে করি এবং ডীভ কমান্ডার মেজর জেনারেল খাজা ওয়াসি উদ্দিন বদলী হইয়া লাহোর হইতে আমাকে প্রশংসা করিয়া একটি পত্র লিখেন।

১৯৬২ সনের আগস্ট মাসে আমাদের দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়। ঢাকার অধিকাংশ এলাকা পানির নীচে ছিল। আর্মিকে বন্যার কাজে নিয়োগ করা হইল। আমি একটি পুরাতন স্টীমার লইয়া ৩০-৪০ জন লোক, ঔষধ, কলেরা ইনজেকশন প্রভৃতি লইয়া মানিকগঞ্জ মহকুমায় যাই। মানিকগঞ্জ কোর্ট বিল্ডিং দুই ফুট পানির নীচে ছিল। মানিকগঞ্জ শহরের আশ পাশের এলাকায় প্রথম কাজ করি। এরপর ঘিওর ও শিবালয় থানার এলাকা, সিঙ্গাইর থানার চারিগ্রাম এলাকা,

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জ শহরের অদূরে গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে মেডিক্যাল কভার দেই। পানি দ্রুত কমিতে থাকে এবং দুই সপ্তাহ পর ফিরিয়া আসি।

সি.এম.এইচ. ঢাকায় লেখক দাড়ান বাম দিক হতে সপ্তম। তারিখ ১৪.১২.১৯৬০।

আমি যখন ঢাকা সেনানিবাসে স্টাফ সার্জেনের কাজ করিতাম সেই সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলের গোয়েন্দা প্রধান লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ভট্টাচারিয়া ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী ছিলেন। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসের অতিথি শালায় প্রহরীদের বেস্টনির ভিতর থাকিতেন। তাঁহার অসুখের খবর আসিলে আমি দেখিতে যাইতাম। তাঁহার অতীত জীবনের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় এক হিন্দু পরিবারে। স্কটিস চার্চ স্কুলে পড়ার সময় খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। স্কটিস চার্চ কলেজ হইতে পাশ করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন এবং সেখান হইতে ফিলোসফিতে এম. এ. পাশ করেন। ইহার পর কলিকাতায় স্কটিস চার্চ্চ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করিয়াছিলেন। আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মিলিটারীতে কমিশনড এর জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তখনো তিনি স্থির করেন নাই কোন্ চাকুরীতে যোগদান করিবেন। এমতাবস্থায় একদিন কলিকাতা জেলা প্রশাসকের অফিসে যাইয়া দেখিলেন ইংরেজ আই. সি. এস জেলা প্রশাসক নীচে নামিয়া আসিয়া জীপে আগত এক ইংরেজ লেফটেন্যান্টকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি

www.pathagar.com

বুঝিয়াছিলেন মিলিটারী চাকুরী অনেক সম্মানের। তাই মিলিটারিতে যোগদান করিয়া ছিলেন এবং সিগন্যাল কোরে চাকুরী শুরু করেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহার সেই ধারণা পরবর্তী কালে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে এবং তিনি দেখিয়াছেন আই. সি. এস. চাকুরীর প্রশাসনিক ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল।

যশোর সেনানিবাসের সেনা ছাউনির এক ক্যান্টিনের কর্মচারীর সাথে তাহার সংস্থার যোগাযোগ ছিল। সেই লোক তাঁহাদের ইনফরমার ছিল। সে হিন্দু ধর্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। সে যশোর সীমান্তের নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে তাহাকে গোপনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছিল কিন্তু এর আগেই পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ধরা পরে। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে সেই লোকের পায়ে শিকল বাঁধিয়া নির্দিষ্ট স্থানে খাড়া অবস্থায় রাখা হইয়াছিল এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা ফায়ারিং অবস্থায় ওৎ পাতিয়া থাকে। সেই লোকের কাছাকাছি পৌছিবার পর লেঃ কর্ণেল ভট্টাচারিয়া বুঝিয়া ছিলেন যে তিনি একটি ষড়যন্ত্রে পরিয়াছেন। পালাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু পায়ে গুলি লাগায় মাটিতে পরিয়া যান এবং ধরা পরেন।

তাঁহার সহ ধর্মিনী একজন হিন্দু অধ্যাপিকা ছিলেন এবং তখন তাহাদের চৌদ্দ বছরের এক পুত্র সন্তান ছিল। তাঁহার স্ত্রী ঢাকা হাইকোর্টে তাঁহার আটকাদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। প্রতিদিন আদালতে হাজির হইবার আগে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতাম এবং ফিট্‌নেস সার্টিফিকেট প্রদান করিতাম। সেই মামলায় তাঁহাকে আট বছরের জেল দেওয়া হইয়াছিল। তখনকার রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিয়াছিলেন এবং কয়েক মাস পর মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান।

আমি স্টাফ সার্জন থাকা কালীন জেনারেল রহিমকে কিছুদিন পাইয়াছি। পরে জেনারেল হক নেওয়াজকে, জেনারেল খাজা ওয়াসি উদ্দিনকে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাইবার কিছুদিনের মধ্যে কুমিল্লা বদলী হইয়া যাই। সি. এম. এইচ ঢাকায় ১৫ই নভেম্বর ১৯৬০ হইতে ২০ শে জানুয়ারী ১৯৬৩ পর্যন্ত চাকুরী করি।

www.pathagar.com

১৫

কুমিল্লা সেনানিবাসে আমার ব্যস্ততাপূর্ণ কর্মজীবন।

আমি কুমিল্লা সেনানিবাসে ৪০ ফিল্ড এম্বুলেন্সে ২১ জানুয়ারী ১৯৬৬ তারিখে যোগদান করি। সেখানে যাওয়ার পরই আমাকে চট্টগ্রামের হাট হাজারি ফায়ারিং রেঞ্জে আরটিলারি এবং মরটার ব্যাটারিগুলির বার্ষিক ফায়ারিং প্র্যাকটিসে মেডিক্যাল কভার দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। আমি সেখানে দুই সপ্তাহ ছিলাম। সেই সময় এক কাঠুরিয়া ফায়ারিং এরিয়ায় কাঠ কাটিতে যায় এবং মৃত্যু বরণ করে। চট্টগ্রাম মর্গে আমি তাহার লাশ দেখিতে যাই এবং সমস্ত শরীরে এস্‌প্লিন্টারস্ জখম দেখিতে পাই।

২৩শে মে ১৯৬৩ তারিখে চট্টগ্রামের সাইক্লোন এবং জলোচ্ছাসের ডিউটিতে একটি এ. ডি. এস নিয়া রওনা হই। আমার সঙ্গে প্রায় ৭০ জন লোক, ১৫-২০ টি বিভিন্ন ধরণের গাড়ী এবং চিকিৎসা সামগ্রী নিয়া রওয়ানা হই। বিকাল চারটায় রওনা হইয়া তিন ঘন্টার পর ফেনী পৌছিয়াছিলাম। কারণ রাস্তায় ঝড়ে ভাঙ্গা অনেক গাছ পরিয়া ছিল এবং সেইগুলিকে কাটিয়া পথ পরিস্কার করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ফেনী এবং করেরহাটের মাঝে সবচেয়ে বেশী গাছ পরা ছিল। রাত ১০টায় সীতাকুন্ড পৌঁছি এবং সেখানে দেখি যে একটা সমুদ্রগামী জাহাজ সাইক্লোন এবং জলোচ্ছাসে সমুদ্রের তীরে মাটির উপর আটকা পরিয়া আছে। রাত ১২ টায় চট্টগ্রাম পৌঁছি এবং সেখানে কমিশনারের অফিসে ব্রিগেড কমান্ডার এবং ডিসির উপস্থিতিতে আমার মিটিং হয়। আমাকে এইটুকু জানাইয়া দেওয়া হয়- যে কক্সবাজার এলাকায় খুব ক্ষতি হইয়াছে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিয়াছে। আমাকে এলাকা খুঁজিয়া বাহির করিয়া জখম লোকদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে ঔষধ, গজ, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি নেওয়া হইল। আমাকে রিকুইজিশন করিয়া আরো কয়েকজন সিভিলিয়ান ড্রাইভার গাড়ীসহ দেওয়া হইল। আনোয়ারা থানা এবং পটিয়া থানায় খোঁজ নিলাম। দেখিলাম সেখানে সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা আরো সম্মুখে পাওয়া যাইবে বলিয়া জানিলাম। সন্ধ্যায় দো-হাজারি পৌঁছিলাম এবং হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ক্যাম্প করিলাম। রাত্রে পাক করিয়া সবাই নৈশ আহার সমাধা করিলাম। ইহার পরদিন ভোরে ২৫ শে মে ১৯৬৩ তারিখে সিনিয়ার জে, সি. ও কে লইয়া আমি সাতকানিয়ায় যাই। সেখানকার থানা হইতে সেই থানার এবং বাঁশখালি থানার অবস্থা জানিলাম। নাস্তা খাইয়া

www.pathagar.com

গাড়ীর বহর লইয়া চকোরিয়া যাই এবং সেখানে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা জানিয়া লইলাম। দুলুহাজরা ফরেস্ট রেস্ট হাউসে আমরা ক্যাম্প অফিস করিলাম। দুলুহাজারার একটি গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিল এবং সেই গ্রামের কোন লোক সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষা পায় নাই। কুতুবদিয়া দ্বীপের উপর দিয়া জলোচ্ছ্বাস অতিক্রম করিয়াছিল। কক্সবাজারে এস,ডি, ও এবং অন্যান্য কর্মবকর্তাদের লইয়া সভা করিলাম। ছোট ছোট দল গঠন করিয়া বিভিন্ন জায়গার চিকিৎসা, কলেরা টাইফয়েডের ইনজেকশন এবং পানি প্রতিশোধক বড়ি দিয়া পাঠাই। প্রায় মাস্‌খানেক এই দল কাজ করে। সেপ্টেম্বর -অক্টোবর মাসে অফিসারস কমান্ডো ট্রেনিং গ্রুপের সাথে করের হাট হইয়া রামগড় এলাকায় মেডিক্যাল কভার দিতে যাই। সেই পাহাড় জঙ্গল এলাকায় প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। কুমিল্লা হইতে ২৪ শে মে ১৯৬৪ তারিখে প্যাথোলজিতে ট্রেনিং.এর জন্য এ. এফ. আই. পি রাওয়ালপিন্ডি রওয়ানা হই এবং সেখানে ২৫শে মে ১৯৬৪ তারিখে যোগদান করি।

www.pathagar.com

১৬

এ. এফ. আই. পি রাওয়ালপিন্ডিতে প্যাথোলজি ট্রেনিং (২৫শে মে ১৯৬৪-১৭ মে ১৯৬৫) এবং আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ)

এ. এফ. আই. পি রাওয়ালপিন্ডিতে আমি প্যাথোলজিতে এক বছরের ট্রেনিং এর জন্য যাই। সেখানে ২৫ শে মে ১৯৬৪ তারিখে যোগদান করি। ট্রেনিং এর শেষপ্রান্তে পাক-ভারত যুদ্ধের দামামা বাজিতে শুর করে। আমি ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ তারিখে মেজর পদে উন্নীত হই। ট্রেনিং শেষ করিয়া শিয়ালকোটে ৪১ ফিল্ড এম্বুলেন্সে যোগদান করি। শিয়ালকোটে পৌছিয়া ইউনিটটি পশরুর শহরের পাশে এক আম বাগানে যুদ্ধের অবস্থানে পাই। সেই ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেঃ কর্নেল মোঃ ইউসুফ গজনভি। তিনি খুব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তবে যাহারা কাজ জানিত তাহাদেরকে পছন্দ করিতেন। আমার সাথে কোন সময় মেজাজ দেখান নাই। আমি ফ্যামিলিকে রাওয়ালপিন্ডির গ্যাটমল হোটেলে রাখিয়া গেলাম। সেই হোটেলটির বামে আর্মির চীফের বাসা ছিল এবং ডান দিকে ছিল জেলখানা। সেই হোটেলেই ট্রেনিং এর সময় থাকিতাম। দুইমাস পর শিয়ালকোটে ফ্যামিলি নিয়া আসিলাম। আমাদের ইউনিট যুদ্ধাবস্তার হাসপাতাল রূপে কাজ করিতেছিল। দুইটি এ, ডি, এস দুইটি ব্রিগ্রেডকে মেডিক্যাল কভার দিতেছিল। একটি ব্রিগেড নরওয়ালে এবং একটি চোয়ান্ডান্তে ছিল। আমাদের অবস্থান ভারতের গুরুদাসপুর জেলার সীমান্ত হইতে চারি মাইল ভিতরে এবং অন্য দিকে জম্বু সীমান্ত হইতে ৮-১০ মাইল ভিতরে ছিল। অর্থাৎ ভারতীয় সীমান্তের কাছে। ৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে আমাদের ইউনিটের লেফটেন্যান্ট জামিল ইঞ্জিনিয়ারিং দলের সাথে বর্ডারে মাইন পুঁথিবার কাজে মেডিক্যাল কভার দিতে যায়। অতর্কিত ভাবে ভারতীয় সৈন্যদের হামলায় তাহারা বন্দী হয়। লেঃ জামিলের সাথে একজন নার্সিং এসিস্ট্যান্ট, একজন ড্রাইভার এবং একটি এম্বুলেন্স জীপ ছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে মধ্যরাত্র হইতে নরওয়াল সেক্টরে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। ভোর হইতে আমরা যুদ্ধাহত সৈনিকদের গ্রহণ করিতে থাকি। ৭ই সেপ্টম্বর ভারতীয় ন্যাট প্লেন বিভিন্ন টারপেটে বোমা ফেলিতে থাকে। বিকাল ৪টায় আমাদের উপর ৪-৫ টি প্লেন বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং সেই সময় আমি যুদ্ধাহত রোগীদের দেখিতেছিলাম।

সব কিছু বাংকারের ভিতর ছিল তথাপি সোজা অবস্থায় যে বোমাগুলি পরিয়াছিল সেইগুলি যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল। আমি পার্শ্ববর্তি ট্রেন্চের ভিতর

www.pathagar.com

চলিয়া যাই। যে ভাবে গরম বালিতে মটর ভাজার আওয়াজ হয় সেই ভাবে বোমাগুলি ফুঁটিতে ছিল। সেই আক্রমণে আমাদের হাবিলদার কেরানী ফয়েজ শহীদ হন। আরো কয়েকজন জখম হয়। বোমার আওয়াজে এক সৈনিকের এক কানের পর্দা ফাটিয়া যায়। একটি ৬৮ মিঃমিঃ রকেট বোমা না ফাটিয়া আমার ব্যক্তিগত তাঁবুর ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমার ঝুলানো হ্যাংগারগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। পাশের মোটা গাছটি ভেদ করিয়া প্রায় ২০০ গজ দূরে গিয়া পড়ে। সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা গুটাইতে থাকি। কারণ এই স্থান শত্রুদের টারগেট হইয়াছে। শিয়ালকোটে বেশ বড় বড় কয়েকটি বন জঙ্গল আছে। সেই দেশের লোকেরা সেইগুলিকে রাখ্ বলে। সেই রূপ এক রাখের ভিতর আমরা ৭-৮ সেপ্টেম্বরের রাত কাটাই। আমাদের অবস্থান দেখা যাওয়ার কথা নয়। তথাপি ভারতীয় বোমারুরা সেখানেও ভোরে ন্যাট প্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। রাস্তায় কিছু রসদ এবং গোলাবারুদের গাড়ীর বহর যাইতেছিল। সেই ট্রাক গুলির উপর বোমা ফেলিতে থাকে। কয়েকটি গোলাবারুদের ট্রাকে আগুন ধরিয়া যায়। সেই দিন আমরা ১-২ টা করিয়া গাড়ি দূর দূর অবস্থান নিয়া শিয়ালকোট সেনানিবাসের দিকে যাইতে থাকি এবং শিয়ালকোট হইতে পশরুর দিকে ৪ মাইল ফলকের নিকট এক আমবাগানের ভিতর অবস্থান নেই। সেই বাগানের পাশে একটি পাকা বাড়ী ছিল। আমরা সেই পরিত্যক্ত বাড়ীটাও দখল করি। সেই বাড়ীর লোকজন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। পরে জানা গেল সেই বাড়ীর এবং বাগানের মালিক একজন অবসর প্রাপ্ত সেনা অফিসার। তাঁহার নাম ছিল লেঃ কর্নেল রহমত আলী। আমাদের নতুন অবস্থান যুদ্ধে অবস্থানরত সকল ইউনিটকে জানাইয়া দেওয়া হইল।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সনে আমি ফ্যামিলীকে দেখার জন্য শিয়ালকোট সেনানিবাসে যাই। সেইখানে যাইয়া দেখি শিয়ালকোট সেনানিবাস লোকশূন্য। ২-৪ টা ফ্যামিলী ছাড়া সবাই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় আমি দুপুর ১২ টায় আমার ফ্যামিলীকে করাচী গামী শাহীন এক্সপ্রেসে উঠাইয়া দিলাম এবং আমার বড় ভায়রা লেঃ কমান্ডার এম. হেদায়েত উল্লাহর নিকট করাচীর ন্যাপিয়ার ব্যারক এলাকায় পাঠাইয়া দিলাম। ট্রেন যখন শিয়ালকোট রেলওয়ে ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল সেই সময় ষ্টেশনের পাশের বিল্ডিং এ একটি বড় আকারের বোমা পরিয়া বিল্ডিং ধ্বংস হইয়া যায়। আমার ফ্যামিলীর সাথে ব্যাটম্যানকে তাহাদেরকে করাচী পৌছাইয়া দিতে সেই ট্রেনে পাঠাইয়া দিলাম।

টেলিগ্রাম অফিসে যাইয়া দেখি লাইন বিকল হইয়া আছে। আমার লিখিত টেলিগ্রাম ফরম এবং টাকা টেলিগ্রাফ কেরানীর নিকট রাখিয়া আসিলাম যাহাতে সে করাচীতে আমার ম্যাসেজটি পাঠাইয়া দেয়। এই দূরবস্থার সময় সবাই দরদী

www.pathagar.com

ছিল। সেই লোকটি আমার ম্যাসেজ ঠিকই পাঠাইয়া ছিল এবং আমার ফ্যামিলী করাচী পৌছাইবার আগেই আমার ভায়রা সেই ম্যাসেজটি পান। প্রতিদিন যুদ্ধে হতাহত হইতেছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর আমাদের ফিল্ড হাসপাতালে ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী হইতে ৩০-৪০ জন সৈনিক আহত হইয়া আসে। তখন বেলা ১১টা। যেখানে এই যুদ্ধ হয় সেই জায়গা আমাদের জায়গা হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থান হইতে আমরা মাত্র ৩ মাইল দূরে ছিলাম। খবর লইয়া দেখা গেল ৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এই ফিল্ড হাসপাতাল ভারতীয় সৈন্যদের মুখামুখি অবস্থানে ছিল। শিয়ালকোট এলাকার ডিভ হেড কোয়ার্টার আমাদের অবস্থান হইতে ১৭ মাইল পিছনে ছিল। আমাদের মেডিক্যাল ব্যাটালিয়ান ২০ মাইল পিছনে ছিল। এমতবস্থায় আমরা পিছনের দিকে চলিয়া আসিব কিনা সেই আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম। আমাদেরকে সেই অবস্থায় থাকিতে বলা হইল। ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে কোন পাক বাহিনী ছিল না। ১৬ সেপ্টেম্বরে ১৮ বেলুচ রেজিমেন্ট আসিয়া আমাদের সম্মুখে অবস্থান নেয়। এর পর হইতে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পাক বাহিনী কিছু আগাইয়া যায়। যুদ্ধের এই অবস্থায় ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে "সিস ফায়ার" ঘোষণা করা হয়।

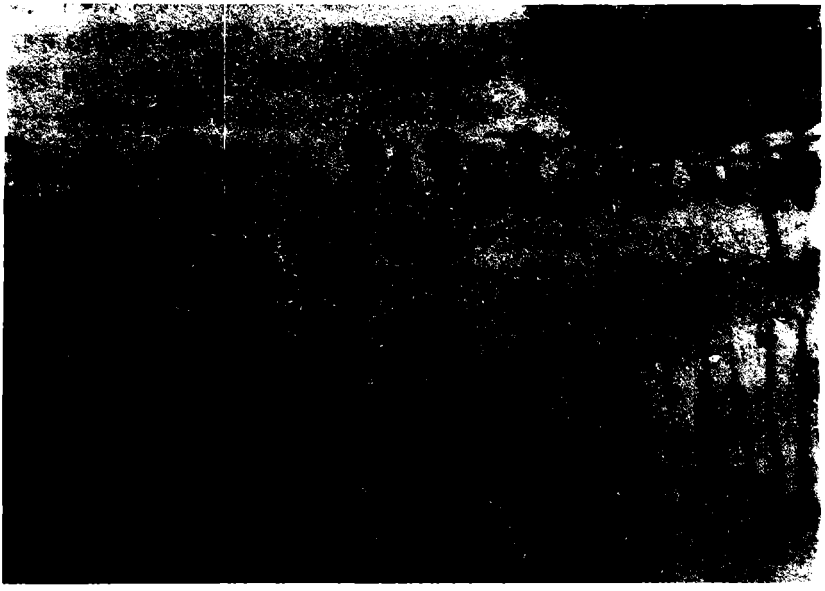

পাকিস্তান বাহিনী ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে জম্মুর ছাম্ব এবং জরিয়ান এলাকা দখল করিয়াছিল। সেই এলাকার পাল্লান ওয়ালা মিলিটারী ফিল্ড হাসপাতালের সম্মুখে উঠানো ফটো। লেখক বাম দিক হইতে ৩য়। তারিখ ৪.১১.৬৫

www.pathagar.com

আমাদের ৪১ ফিল্ড এম্বুলেন্সের তিনজন যুদ্ধবন্দী ছিল। এই ইউনিটটি কাশ্মীর ফ্রন্টে পাঠাইবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। যাহাতে বর্তমান অবস্থান শত্রুপক্ষ না জানে। ১৯৬৫ সনের অক্টোবরের মাঝামাঝি আমাদেরকে জম্মু-কাশ্মীর এলাকায় ছাম্ব -জরিয়ান সেক্টারে পাঠানো হইয়াছিল। এই এলাকা পাক বাহিনী জয় করিয়া দখল করিয়াছিল। আমরা গুজরাট হইয়া ছাম্ব এলাকার নিকটবর্তী টান্ডা গ্রামের জঙ্গলে অবস্থান নেই এবং সেখান হইতে ছাম্ব জরিয়ান এলাকায় মেডিক্যাল কভার দেই। জরিয়ান হইতে জম্মু এবং কাশ্মীর উপত্যকার সংযোগ রাস্তা আখনুর দেখা যাইত। পাক বাহিনী ছাড়া সেই এলাকায় কোন লোকজন ছিল না। সেখানকার লোকেরা বাড়ী ঘর ছাড়িয়া যুদ্ধের সময় পালাইয়া গিয়াছিল। আমরা সেখানে তিন মাস ছিলাম। তারপর আবার শিয়ালকোটে যুদ্ধের অবস্থান জায়গায় ফিরিয়া আসি। সেখানে অবস্থান করিয়া ৪-৫টি মেডিক্যাল টিম গঠন করিয়া মাইন্‌স উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত লোকদেরকে মেডিক্যাল কভার দিতে থাকি এবং মাঝে মাঝে ভারতীয় সৈন্যদের ছাড়িয়া যাওয়া এলাকাগুলি পরিদর্শন করিতে যাই। এইরূপ আরো কয়েক মাস চলিয়া গেল। ১৯৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কয়েক দিনের ছুটিতে করাচী যাই এবং ফ্যামিলীকে আবার রাওয়ালপিন্ডির গ্যাটমল হোটেলে রাখিয়া আসি। কাশ্মীর ফ্রন্ট হইতে ইউনিট যখন আবার শিয়ালকোট ফিরিয়া আসিল তখন ফ্যামলী আবার শিয়ালকোট লইয়া আসিলাম। আস্তে আস্তে শান্তি ফিরিয়া আসিল এবং এক বছর যুদ্ধ অবস্থায় ফিল্ডে চাকুরী করিয়া করাচীর মালির সেনানিবাসে সি.এম.এইচ মালিরে প্যাথোলজিস্ট হিসাবে আমার বদলী হয়। আমি ১৭ই মে ১৯৬৬ তারিখে যোগদান করি।

শিয়ালকোটে যুদ্ধের সময় বাংকারের ভিতর রাত্রের আহার। বামদিক হইতে লেঃ কর্নেল ইস্‌হাক আনোয়ার খাজা এবং মেজর মুঃ মাহ্‌ফুজ হোসেন। তারিখ ২.১.৬৬।

www.pathagar.com

১৭

সি.এম.এইচ মালির ক্যান্টনমেন্টে (করাচীতে) কর্মজীবন (১৭ই মে ১৯৬৬– ৩রা মার্চ ১৯৬৯)

প্যাথোলজিস্ট হিসাবে পোস্টিং হইলেও আমাকে ৫০ বেডের টি,বি ওয়ার্ড, হাসপাতালের মেডিক্যাল স্টোর, মেডিক্যাল বোর্ডের প্রথম সদস্য (যিনি সব কিছু করেন এবং কমান্ডিং অফিসার ও দ্বিতীয় সদস্য শুধু স্বাক্ষর করেন)। প্যাথোলজি এবং মেডিক্যাল স্টোরের বেহাল অবস্থা ছিল। সেইগুলিকে নিয়মিত ভাবে চলার অবস্থায় আনিলাম। সমস্ত সিন্ধু প্রদেশের এবং পাঞ্জাবের মূলতানের পর বাকী এলাকার লোকদের কমিশন মেডিক্যাল বোর্ড সি.এম.এইচ মালিরে হইত। তাহা ছাড়া ৩০০-৪০০ রোগীদের মেডিক্যাল বোর্ড সব সময় লাগিয়াই থাকিত।

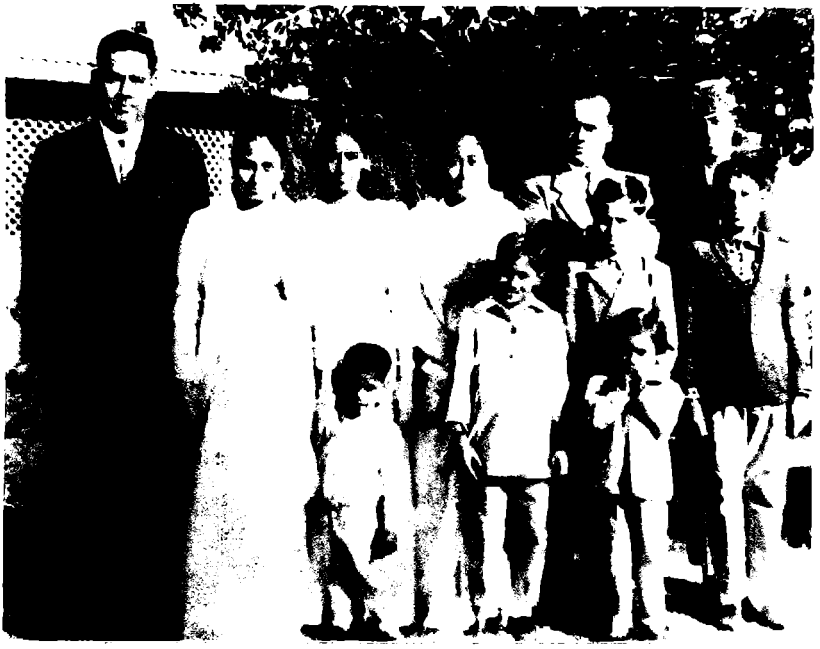

মালির সেনা নিবাসে নিজ বাসায় ঈদের দিন। লেখক এবং তদীয় স্ত্রী বাম দিকে এবং ডান দিকে একমাত্র ভায়রা মোঃ হেদায়েত উল্লাহ এবং তদীয় স্ত্রী। লেখকের তিন সন্তান এবং ভায়রার চার সন্তান। তারিখ ২.১.১৯৬৮।

www.pathagar.com

আমার কাজের জন্য কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল রিজওয়ানা উল্লাহ্ খান আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রায় ১২-১৪ জন ডাক্তার ছিল এবং অন্যদের কাজের বোঝা আমার হইতে অনেক কম ছিল। কোন ডাক্তার ছুটি গেলে আমাকে সেই ডিউটি দেওয়া হইত। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমাকে কেন এত কাজ দেওয়া হয়। তিনি নরমকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "তোমাকে কোন কাজ দিলে তাহা তুমি সঠিক ভাবে কর এবং আমি রাত্রে আরামে ঘুমাইতে পারি।" আমার কাজের স্বীকৃতি তিনি দিয়াছিলেন, বাৎসরিক রিপোর্টে তিনি আমাকে "এভাব এভারেজ" গ্রেডিং দিয়েছিলেন। তাহাতেও তিনি সন্তষ্ট হন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সুবেদার হেড ক্লাক কে যে সেই বছর তিনটি "এভাব এভারেজ" রিপোর্ট দিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে ভাল কাহাকে লিখিয়াছেন। হেড ক্লার্ক আমাকে পরে বলিয়াছিলেন যে তিনি জানাইয়াছিলেন "মেজর হোসেন সাবকো বেহ্তেরিন রিপোর্ট দিয়া হায়।" কর্নেল আর ইউ খান জবাবে নাকি বলিয়াছিলেন তাহা হইলে তিনি জ্যাস্টিস করিয়াছেন। সেইরূপ প্রথম এ, সি আর কোহাটে লেঃ কর্নেল ইবাদুল্লাহ্ কিচ্লু দিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রামে লেঃ কর্নেল আলতাফ হোসেন দিয়াছিলেন। লেঃ কর্নেল এম, ওয়াই, গজনভি যুদ্ধাবস্তায় শিয়ালকোটে হাই এভারেজ রিপোর্ট দিয়া ছিলেন। তবে এডভাইসের অংশে লিখিয়া ছিলেন– আর্মির রুলস ও রেগুলেশনের সব কিছু তাহার জানা আছে এবং তাহাকে কোন এডভাইসের দরকার নাই। সি.এম.এইচ মালির করাচীতে প্রায় তিন বছর ৫০টি রোগীর টি.বি. ওয়ার্ড দেখিয়াছি, চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে রোগীদেরকে ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হইত এবং কিটস্ দিয়া ছাড়পত্র দেওয়া হইত। সেখানে আমি যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলাম। কর্মবহুল জীবন শেষ করিয়া প্রায় তিন বছর পর মালির হইতে বদলী হই এবং পূর্বপাকিস্তানে রংপুরে ৩রা মার্চ ১৯৬৯ তারিখে ১০ ফিল্ড এম্বুলেন্স হাসপাতালে যোগদান করি।

www.pathagar.com

১৮

রংপুর ১০ ফিল্ড এম্বলেন্স হাসপাতালে কর্মরত জীবন
(৩রা মার্চ ১৯৬৯-১৬ই জুন ১৯৭০)

মালিরে চাকুরী চলাকালীন ঢাকায় পরবর্তী বদলীর জন্য একটা দরখাস্ত করিলাম কিন্তু সেই দরখাস্ত সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করা হয় নাই।

১৯৬৫ সনের যুদ্ধে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদেরকে কারণগুলি দেখাইয়া নিজ এলাকায় পোস্টিং এর জন্য দরখাস্ত দেওয়ার একটা সার্কুলার অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত কারণগুলি দেখাইয়া আবার দরখাস্ত করিলাম। আমাকে জানানো হইয়াছিল যে সময়মত আমার ব্যাপারে বিবেচনা করিবে। আমাকে ঢাকায় বদলী না করিয়া রংপুর ১০ ফিল্ড এম্বুলেন্স হাসপাতালে বদলী করা হইল। ৩রা মার্চ ১৯৬৯ তারিখে ঢাকায় পৌছি। ফ্যামিলী বাসস্থান রংপুরে না থাকায় কোন কোন অফিসারকে ঢাকা সেনানিবাসে ফ্যামিলী বাসস্থান দেওয়া হইত। আমি ঢাকায় ফ্যামিলী বাসস্থানের জন্য দরখাস্ত করিলাম এবং পরদিন আমাকে একটি বাসা দেওয়া হইল। ফ্যামিলীকে ঢাকায় রাখিলাম এবং ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি করাইয়া দিলাম।

রংপুরে পৌছার পর আমার পূর্বসুরী মেজর এস. ডি. আহমদের নিকট হইতে হাসপাতালের ভার গ্রহণ করিলাম। এর পর ইয়াহিয়া খানের মার্শাল 'ল' শুরু হয় এবং সব রকম ছুটি বন্ধ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়। কয়েকমাস ঢাকায় যাইতে পারি নাই। আমার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল এম. ওয়াই. দেওয়ান ফিরিয়া আসার পর কয়েকদিনের ছুটিতে ঢাকায় গেলাম। আবার একটা দরখাস্ত করিলাম যাহাতে আমাকে ঢাকায় বদলী করা হয়। আমাকে সেই দরখাস্তের জবাবে জানানো হইল যে রংপুরের বদলী আমার পূর্বের দরখাস্ত বিবেচনা করিয়াই হইয়াছে। চাকুরী এইভাবেই চলিতে থাকে।

রংপুরে তখন একটি ফিল্ড এম্বুলেন্স পাসপাতাল তাজহাট প্যালেসে ছিল এবং এখানে সৈনিকদের পরিবারের জন্য উপ-শহরে একটি শিশু ও মা কল্যাণ সেন্টার ছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ান থাকিত। সৈয়দপুরে একটি আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং একটি মর্টার ব্যাটারী ছিল। রংপুরে একটি ব্রিগেড ছিল এবং আনুসংগিক মিলিটারীর ছোট ছোট অংশ বাহিনীগুলি ছিল।

আমি ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে আবার দরখাস্ত দিলাম এবং অনুরোধ করিলাম আমাকে অকালপক্ক অবসর দেওয়ার জন্য। সেই দরখাস্ত ইস্টার্ন কমান্ডার

www.pathagar.com

লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবের কাছে পৌছিয়াছিল। তিনি যখন রংপুর পরিদর্শন করিতে আসেন তখন আমাকে অফিসার্স মেসে দুপুরে খাওয়ার আগে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আমাকে দরখাস্তটি ফেরত নেওয়ার জন্য বলিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে তিনি আমার সার্ভিস ফাইল দেখিয়াছেন। আমি দুই বছরের মধ্যে লেঃ কর্নেল হইব। আমি তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে আমাকে পেনশন বেনিফিট দিয়া অবসর পাওয়ার ব্যাপারে যেন তিনি সাহায্য করেন। তিনি আমার অকালপক্ক অবসরের ব্যাপারে নিশ্চিত সাহায্য করিয়াছেন। আমি ১৬ই জুলাই ১৯৭০ তারিখে পেনশন বেনিফিট সহকারে অবসর গ্রহণ করি।

www.pathagar.com

১৯

সামরিক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর কর্ম-তৎপরতা

ছাত্র জীবনে আমার রাজনৈতিক কর্ম পড়াশুনার সাথে চলিয়াছে। ১৯৪৪ সনে যখন ৯ম শ্রেণীতে পড়ি তখন মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিকদল মুসলিম লীগের ছাত্রকর্মি হিসাবে কাজ করি। রাজনৈতিক ধারা ১৯৪৮ সন হইতে পরিবর্তন শুরু হয়। আমরা ছাত্র সমাজ মুসলিম লীগ হইতে দূরে সরিয়া আসি। অধিকাংশ ছাত্র তখন কোন দলভুক্ত ছিল না। তবে কিছু সংখ্যক ছাত্র লীগে এবং ছাত্র ইউনিয়নে ছিল। এ অবস্থায় আমি ১৯৫৫ সালে এম.বি.বি এস পাশ করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করি এবং পরবর্তীকালে আর্মি মেডিক্যাল কোরে যোগদান করি। চাকুরী হইতে অবসর লইয়া সেই সময়কার আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা চিন্তা করিয়াছি কিন্তু সেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আদর্শবান, বিজ্ঞ এবং বয়স্ক নেতার অভাব ছিল। যাহার ফলে আমি রাজনৈতিক দলে যোগদানের ব্যাপারে পাশ কাটিয়া গেলাম এবং পেশাকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে রাগিলাম।

চাকুরীর শেষ দিকে গুলশানের বাড়ীটা প্রভিডেন্টফান্ডের টাকায় এবং নিজের সঞ্চয়ী অর্থ দিয়া শুরু করি। অবসর আদেশ পাওয়ার পর তাড়াহুড়া করিয়া একতলা শেষ করি। ঢাকা সেনানিবাসের বাসায় ১৯৭০ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলাম। ১লা অক্টোবর হইতে নিজের গুলশানের বাড়ীতে বসবাস করিতে থাকি। অন্যদিকে তেজগাঁও থানার পাশে ৪৭ এয়ারপোর্ট রোডে রোগীদের চিকিৎসার একটি চেম্বার করি এবং সেই চেম্বারের পাশে একটা আলাদা ফার্মেসী করি। নিজ চেম্বারের সাথে একটি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী রাখি। আমার পেশাগত কাজকর্ম ভালই হইতেছিল। কিন্তু ১৯৭১ সনের জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ২৫ শে মার্চ হইতে চেম্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। মাসখানিক বন্ধ রাখিবার পর সকালে কয়েক ঘন্টার জন্য খুলিতাম। তখন চলার মত আয় ছিল না। দেশে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। সকল মানুষ ভয়ে দিন কাটাইতেছিল। যেখানে সন্দেহ হইত মিলিটারীরা আসিয়া হানা দিত। মাঝে মাঝে মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট দলে আসিয়া সরকারী অফিসে, সামরিক এবং আধা সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালাইত। এই অবস্থায় দেশের ভিতরে আমরা নিরাশ্রয় অবস্থায় বাস করিতেছিলাম। একদিকে শহরের অনেক লোক নিরাপদ জায়গায় চলিয়া গিয়াছে, অন্য দিকে যাহারা শহরে ছিল তাহারা আতংকে দিন

www.pathagar.com

অতিবাহিত করিতেছিল। নিজ পেশায় প্রসার লাভ করার আগেই আমি দোটানায় পরিয়া গেলাম। আয় নাই কিন্তু উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা যথেষ্ট ছিল। নিজের জমা টাকা বাড়ী বানাইতে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। উপরন্ত ঋণগ্রস্থ হইয়া পরিয়াছিলাম। এই আশায় ঋণ করিয়াছিলাম যে, পেনশনের এককালীন কমিউটেশন টাকা পাইয়া শোধ করিয়া দিব কিন্তু আমার প্রাপ্ত টাকা তখনকার সরকার আটকাইয়া দেয়। কর্তৃপক্ষকে কয়েকবার লিখিয়া জবাব পাই নাই। পরে রাওয়ালপিন্ডিতে এডজুটেন্ট জেনারেলের নিকট ২৭শে জুলাই ১৯৭১ সনে একটা দরখাস্ত দেই এবং অনুরোধ করি যাহাতে আমার কমিউটেশন পেনশন এর প্রাপ্য ৪৬,৪৯৪.১৩ টাকা কর্তৃপক্ষ আর দেরী না করিয়া আমার ব্যাংকে পাঠাইয়া দেয়। বহু লেখালেখির পর ২৯ শে জুলাই ১৯৭১ তারিখে আমার ব্যাংকে সেই টাকার চেক পাঠাইয়া দেয়। সেই টাকা পাওয়ার পর আমার আর্থিক দৈন্যতা কিছুটা লাঘব হইল। এরপর ২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ হইতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পূর্ববর্তী ডাক্তারের ছুটির জায়গায় মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগদান করি। তিনি বিদেশ হইত ফিরিয়া না আসায় আমি ১লা মে ১৯৭২ তারিখ হইতে নিয়মিত নিয়োগপত্র পাই।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হইল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল ঢাকা শহরের দিকে নামিল। মুক্তি বাহিনী এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষ বিজয় উল্লাস ভোগ করিল। নয় মাসের যুদ্ধে মানুষ যেভাবে নিপীড়িত হইয়াছে সেই দিন উল্লাসিত জনতা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভূলিয়া গিয়া একাত্মতা দেখাইয়াছিল তবে এই উল্লাসের মাঝে অনেককে খুন করা হইয়াছে। যাহাদেরকে খুন করা হইয়াছিল তাহারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোক। এই কাজগুলি ছিল জঘন্য এবং অমানুষিক।

www.pathagar.com

২০

হোটেল ইন্টারকন্টিন্যালে মেডিক্যাল অফিসার রূপে যোগদান এবং পরবর্তীকালে হোটেল শেরাটনে চাকুরী।
(২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ – ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৮৬)

স্বাধীন বাংলাদেশে আমার পেশাগত জীবন নূতনভাবে শুরু হইল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেটালে চাকুরীর ফলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিকদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যাপারে আমার সাথে যোগাযোগ হয়। যাহার ফলে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সাথে একটা যোগাযোগের সুযোগ আসে। তাহার মধ্যে কুয়েত, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, বেলজিয়াম, রুমানিয়া এবং আফগানিস্তান উল্লেখযোগ্য। এইসব দেশগুলির কূটনীতিকরা সবসময় বহু বছর আমার সাথে চিকিৎসার ব্যাপারে যোগাযোগ রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া ইরাক, সউদি আরব, পাকিস্তান, মিশর, আলজেরিয়া, ফিলিপাইনস এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনৈতিকদের অনেকে মাঝে মাঝে অনেক বছর যোগাযোগ রাখিয়াছে।

রংপুর তাজহাট প্যালেস সম্মুখে লেখক দাড়ানো মাঝে। ১৪ ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা (মাঝে) এবং তার বামে বসা ব্রিগেডিয়ার সামী। লেঃ কর্নেল এইচ.এম. এরশাদ বাম দিক হতে প্রথম। তারিখ নভেম্বর ১৯৬৯।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের দূর প্রাচ্যরুটে ক্রুদের দল পরিবর্তনের স্থান ছিল ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল। লন্ডন হইতে তাহাদের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ঢাকায় আসে এবং আমাকে তাহাদের ক্রুদের চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করেন। তাই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ক্রুরা চিকিৎসার ব্যাপারে আমার সাথে বহু বছর যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বিভিন্ন নদীর উপর বড় বড় সেতু নির্মাণ কাজে নিয়োজিত আমেরিকান ভি.জেড.পি এর এক্সিকিউটিভগণের চিকিৎসা আমার উপর ন্যাস্ত ছিল। কোন কোন সময় দেখিয়াছি সিলেট এবং ময়মনসিংহ হইতে বিভিন্ন আমেরিকান কোম্পানীর কর্মকর্তারা আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে। অন্যদিকে আমার এয়ারপোর্ট রোড চেম্বারে দেশী এবং বিদেশী রোগীরা চিকিৎসার ব্যাপারে আসিয়াছে। এই ভাবে আমি সকাল হইতে রাত নয়টা দশটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকিতাম। এই ব্যস্ততা আমার পনরটি বছর চলিয়াছে।

১৯৮২ সনে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কর্মচারীদের দাবী ছিল হোটেলের ডাক্তারকে অন্যদের মত সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত কাজ করিতে হইবে। আমার কাজের সময় ছিল সকাল নয়টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এই ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ আমাকে জানাইলে আমি অপারগতা ব্যক্ত করিয়াছি। হোটেলের কর্মচারীরা আবার সাধারণ সভা করে এবং আমাকে পূর্বের নিয়মে কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করে। তাহারা কর্তৃপক্ষকে বিকাল ৩-৫ টার সময় অন্য একজন ডাক্তার নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করে। তখনকার জার্মান জেনারেল ম্যানেজার মিঃ স্নোপি আমাকে একজন জুনিয়র ডাক্তার বিকালের জন্য দিতে বলেন। বিকালের জন্য আমি একজন ডাক্তার আনিয়া দিলাম। আমার পক্ষে কর্মচারীদের এক আওয়াজে মতামত পরিবর্তনের একমাত্র কারণ ছিল তাহাদের সুচিকিৎসা এবং পরিবারের কল্যাণের ব্যাপারে সব সময় সহানুভূতিশীল ছিলাম।

১৯৮৪ সনে হোটেল শেরাটন চেইন হোটেলইন্টার কন্টিনেন্টালের ম্যানেজমেন্টের ভার গ্রহণ করে। তাহাদের আগত নতুন কর্মকর্তাদের সাথে আমার কয়েকবার বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে তাঁহারা হোটেলের বয়স্ক এবং পুরাতন রোগের কর্মচারীরা যাহারা সব সময় ঔষধ ব্যবহার করে তাহাদেরকে মেডিক্যাল কারণে চাকুরী হইতে অবসর দেওয়ার ব্যাপারে আমার সহযোগীতা কামনা করে। স্থির হইল যাহারা মেডিক্যাল কারণে অবসর গ্রহণ করিবে তাহারা সত্তর হাজার টাকা এককালীন ভাতা এবং তিন মাসের বেতন পাইবে। এই অর্থ অতিরিক্ত সাহায্য রূপে দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া তাহাদের একজন উপযুক্ত পৌষ্যকে চাকুরী

www.pathagar.com

দেওয়া হইবে। এই নিয়মে অনেক পুরাতন লোক খুশী মনে অবসর গ্রহণ করিল। ১৯৮৬ সনের নভেম্বরের শেষের দিকে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সাইমনের সাথে আবার কয়েকটি বৈঠক হয়। তিনি ৩০-৪০ জন পুরাতন কর্মচারীদের মেডিক্যাল কারনে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার সহযোগিতা কমনা করেন। কর্মচারীদেরকে তিনি কোন আর্থিক সুবিধা না দিয়াই বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি পূর্বের ন্যায় অবসর ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা ছাড়া তাহাদেরকে মেডিক্যাল কারণে অবসর দেওয়ার ব্যাপারে একমত হইতে পারি নাই। আমার তখন ৫৭ বছর পূর্ণ হইবে। হয়তো আরো ২ বছর চাকুরী বাড়ানো যাইত। কিন্তু আমি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ না দেখিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম আমি ১৯৮৬ সনের ৩১ ডিসেম্বর ৫৭ বছর পূর্ণ করিব। সেইদিন আমি হোটেলের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিব। তিনি আমার কথা মানিয়া ছিলেন এবং ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চাকুরী করিতে বলিলেন এবং ডিসেম্বর মাস ছুটি দিলেন। আমি অবসর নেওয়ার আগে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, হোটেলের কর্মচারীরা আন্দোলন করিতে পারে এবং তিনি সেই অবস্থায় থাকিতে পারিবেন না। আমি চলিয়া যাওয়ার পর এমন আন্দোলন শুরু হয় যে, তাঁহাকে হোটেল হইতে এক দুপুর রাত্রে প্লেনে করিয়া দুবাই পালাইয়া যাইতে হয় এবং তাহার সহযোগী পারসনেল ডিরেকটরকে চাকুরী ছাড়িয়া যাইতে হয়।

www.pathagar.com

২১

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেশ শাসনের ব্যাপারে আমার অভিমত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোচনার আগে পাকিস্তানের শেষ লগ্নে আমাদের সংগ্রামী নেতাদের ব্যাপারে কিছু বলা দরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি ১৯৪৭ সাল হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় এবং শোভাযাত্রাতে দেখিয়াছি। একই শোভাযাত্রায় শ্লোগান দিয়াছি। মাওলানা ভাসানীর সভায় পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করিতেন এবং সেই সভায় প্রায়ই যোগদান করিতাম। অনেক সময় পুলিশের ধাওয়া খাইতাম। তাজ উদ্দিন, জিল্লুর রহমান, অলি আহাদ এবং মহি উদ্দিনকে ঢাকা কলেজে ১৯৪৬ সালে ভর্তি হইবার পর হইতে ছাত্র নেতা হিসাবে দেখিয়াছি। আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র রাজনীতি করিতাম। আর আমাদের তখনকার ছাত্র নেতাগণ রাজনীতির ফাঁকে ফাঁকে পড়িতেন। যাহার ফলে তাহাদের পড়ায় অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা পড়ার জন্য সময় কম দিতে পারিতেন। ছাত্রনেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক কারাবরণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর দান, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান, শফিউল্যা, খালেদ মোশাররফ এবং অন্যান্য কমান্ডারদেরকে কোনমতেই ছোট করিয়া দেখা উচিৎ নয়। সেই দুর্দিনে জিয়াউর রহমানের চট্টগ্রাম রেডিও হইতে বঙ্গবন্ধুর নামে যুদ্ধের জন্য আহবান দিশাহারা বাঙ্গালীর মনের বল অনেকাংশে বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের অবদানকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা উচিত হইবে না।

আমি আগেই বলিয়াছি, আমি কিশোর জীবন হইতে ছাত্র রাজনীতি শুরু করি। ১৯৪৪ সনে যখন ৯ম শ্রেণীতে পড়ি তখন হইতে রাজনীতি শুরু করি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হইতে নভেম্বর ১৯৫৫ সনে এম. বি.বি. এস পাশ করার আগ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম। রাজনীতি আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল কিন্তু বিবেক এত সচেতন ছিল যে, আমি এক ঘেয়েমি রাজনীতিকে পছন্দ করি নাই। বিবেককে সব সময় প্রশয় দিয়াছি। যাহার ফলে ১৯৭০ সনে মিলিটারী চাকুরী হইতে অবসর নেওয়ার পর দেশের প্রচলিত রাজনীতি ধারার

www.pathagar.com

সাথে নিজের ভাবধারার মিল হয় নাই এবং রাজনৈতিক দলে যোগদান করি নাই। স্বাধীন বাংলাদেশে যাঁহারা প্রথম সরকার গঠন করিলেন তাঁহারা বাকশালের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। সেই পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রধানের আত্মীয় স্বজনরা সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। এই অবস্থায় দেশের লোকেরা নিজেদেরকে নিঃসহায় বোধ করিতেছিল। সেই সময় দুইজন ব্যক্তিত্ব জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী এবং ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন সরকারী দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাড়ে তিন বৎসরে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট রাত্রে যে মর্মান্তিক হত্যাগুলি ঘটিয়াছিল তাহাতে আমি মর্মাহত হইয়াছিলাম এবং এই জঘন্য কর্মকান্ডকে বর্বোরোচিত কাজ বলে আখ্যায়িত করিয়াছিলাম। নীতি এবং ভাবধারার মধ্যে ব্যবধান থাকিতে পারে তাই বলিয়া তাহার প্রতিশোধ নির্মম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে লইতে হইবে এটা মানব সভ্যতার পরিপন্থী। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট যাহারা বর্বরোচিত হত্যাকান্ড চালাইয়াছিল তাহাদের বিচার পরবর্তী সরকারের করা উচিত ছিল কিন্তু সেই খুনীদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকুরী দিয়া তাহাদেরকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। এই খুনীদের বিচার হইলে দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র স্থাপিত হইত। উপরন্ত খুনীদের কার্য্যকলাপকে সায় দেওয়া হইয়াছে। যাহার ফলে ১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বর আবার আওয়ামী লীগের চার শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরকে ঢাকা জেলে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

খন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং বিচারপতি সায়েম কিছুদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের শাসন কায়েম করেন। সেই গণতন্ত্র অবশ্যই সর্বদলীয় ছিল না। সেই সরকারের সময় ভিতরে ভিতরে অনেক বিদ্রোহ হইয়াছে এবং সেইগুলিকে নির্মমভাবে দমন করা হইয়াছিল। আবার জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে আরেক দল সামরিক অফিসার চট্টগ্রামে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং জিয়াউর রহমান শহীদ হইয়াছিলেন।

বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হইলেন এবং পরে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তার গণতান্ত্রিক সরকার পুরোপুরি কায়েম করার আগেই তখনকার সেনা প্রধান এইচ, এম, এরশাদ-এর দ্বারা বিতাড়িত হইলেন। গণতন্ত্র পদ্ধতি চালুর একটা সুযোগ নষ্ট হইল।

আজকাল পৃথিবীর কোথাও স্বৈরাচারের স্থান নাই। বাংলাদেশ তাহা প্রমাণ করিয়াছে। সকল দলের আন্দোলনের মুখে সেই স্বৈরাচার শাসকের পতন

www.pathagar.com

হইয়াছিল। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্তবর্তী সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সেই অগণতান্ত্রিক সরকারের পতন হইয়াছিল।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বিজয়ী হয় এবং জামাতে ইসলামীর সহায়তায় সরকার গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদের পাঁচ বছর শাসনকালে দেশে সর্বস্তরে দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম ছিল। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হইতে সরিয়া যাওয়ার কারণে তাহারা বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে অন্তবর্তী সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছিল। গণতন্ত্রকে পুরাপুরি কায়েম না করিয়া সেই সরকারের পাঁচ বছর দলীয়করণ নীতি চালাইয়া যায়। গণতন্ত্রে কিছুটা দলীয় করণ হয় কিন্তু ঢালাইভাবে দলীয় করণ গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা অনেক জীবনের বিনিময়ে গণতন্ত্র পাইয়াছি। গণতন্ত্রের মূল্যবোধ আমরা ক্ষমতা পাইলেই ভুলিয়া যাই। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়ী হয়। জাতীয় পার্টির সহায়তায় তাহারা সরকার গঠন করিয়াছে। এই দল কোয়ালিশন সরকার না বলিয়া নিজেদেরকে ঐকমত্যের সরকার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। বিগত এক বছরে এই সরকার সত্যিকারের গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরূপে পরিচয় দিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদসহ পছন্দমত পদগুলিতে নিজেদের লোক নিয়োগ করিয়াছে। গণতন্ত্রের ধারায় প্রত্যেককে নিজের চাকুরীর মেয়াদ পর্যন্ত রাখিতে হইবে। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি সরকারের আদেশ লংঘন করিতে পারিবে না। এই সরকারের প্রতি আমার অনুরোধ তাহারা যেন গণতন্ত্রের সঠিক মূল্যায়ন করেন।

আমাদের গণতন্ত্রের মধ্যে যে জিনিষটির সবচেয়ে বেশী অভাব তাহা হইল আমাদের লোকেরা এখনো দেশ প্রেমিক রূপে পরিচয় দিতে সক্ষম হয় নাই।

www.pathagar.com

২২

দেশ গড়ার ব্যাপারে আমার কার্যক্রম

আমি বিগত ২৬ বছর ধরিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমার মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। ১৯৮২ সনে তখনকার সরকারের ঔষধ নীতির বিপক্ষে আমি জোড়ালো মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। আমার মতামত সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় ২১, জুলাই, ১ আগস্ট এবং ৮ আগস্ট, ১৯৮২ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি রিভিউ কমিটির সম্মুখেও হাজির হইয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমেরিকায় ১৯৩৮ সনে ঔষধ নীতির উপর আইন পাশ করিয়াছিল যখন ১৭০ জন শিশু সালফনোমাইড সিরাপ সেবন করার ফলে মারা যায়। এই সিরাপে ডাই-ইথাইলিন নামক কেমিক্যাল সলভেন্ট হিসাবে ব্যবহার করার ফলে এই মৃত্যু ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশে কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী এই কেমিক্যাল প্যারাসিটামল সিরাপে ব্যবহার করার ফলে ১৯৯৪ সালে কয়েক হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। আবার ১৯৬১ সনে ঔষধ নীতির উপর আমেরিকায় আইন প্রনয়ন করে যখন থ্যালিডোমাইড বড়ি খাইয়া অনেক মহিলা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম দেয়। আমাদের সেই ঔষধ নীতির প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল শুধু দরকারী ঔষধের নিয়ন্ত্রণ করা।

জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সকল যানবাহনের লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব পর নয়। সেই ব্যাপারে ৯ই জুলাই ১৯৮৩ তারিখে জোনাল মার্শাল ল এর নিকট দরখাস্ত দেই এবং ১৪ই জুলাই ১৯৮৩ তারিখে দেখা করি। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের সাথেও দেখা করি। মটর যান লাইসেন্স নবায়নের ব্যাপারে আমার চিঠি বাংলাদেশ অবজারভারে ৫ই আগস্ট ১৯৮৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলাম রেজিস্ট্রেশন তারিখ মোতাবেক যানবাহন লাইসেন্স নবায়ন করার নীতি প্রবর্তন করা। আমার সেই চিঠির কিছুদিন পরই এই পদ্ধতি চালু হয়।

ড্রাগ লাইসেন্স খুচরা দোকানের জন্য দুই শত টাকা হইতে নবায়ন ফি দুই হাজার টাকা করা হয়। আমার চিঠি ইত্তেফাকে ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ছাপানো হয়। কিছু দিন পর নবায়ন ফি কমানো হয়।

ঢাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করিয়া কাঁচা বাজার তৈয়ার করিবেন এই উক্তি তখনকার মন্ত্রী মহোদয় করিয়াছিলেন। কাঁচা বাজারগুলি অন্ধকার গুদাম ঘরের মত এবং দিনের বেলায় আলো জ্বালাইতে হয়। তাই আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম যাহাতে ভবিষ্যতে সেই ধরণের কাঁচাবাজার তৈয়ার করা না হয়

www.pathagar.com

এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে কাঁচা বাজার তৈয়ার না করিয়া মাঝে মাঝে ওয়ার্ডগুলিতে যেন "মা ও শিশু ক্লিনিক" তৈয়ার করা হয়। আমার চিঠি ইত্তেফাকে ৪ই নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৬ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশ অবজারভারে আমার প্রবন্ধ "এ ব্রিফ হিসট্রি অব শহীদ মিনার" শহীদ ক্রোড়পত্রে ছাপানো হয়। প্রতি বছর শহীদ দিবসের রাত্রে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি টাংগানো লইয়া মারপিট হইত। সেই বছরও বাদ যায় নাই। বরং এক শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। সেই ব্যাপারে আমার চিঠি সেই পত্রিকায় ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ তারিখে ছাপানো হয়। আমি ফটো বা ব্যানার টাংগানো নিষিদ্ধ করিতে আহবান জানাইয়াছিলাম। পরবর্তী সন হইতে শহীদ মিনারে ফটো এবং ব্যানার টাংগানো নিষিদ্ধ হয়। আমার ১৯৮৬ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে বলিয়াই "বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকা" ১৯৯৭ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ক্রোড়পত্রে আমার সেই প্রবন্ধটি পুনঃ মুদ্রণ করিয়াছে।

১৯৮৮ সনের বন্যার সময় আমার চিঠি বাংলাদেশ অবজারভারে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ তারিখে ছাপানো হয়। চিঠির হেডিং ছিল "ড্রেজিং ফরফ্লাড কন্ট্রোল"। সেই চিঠি ছাপানোর পর তৎকালীন সরকার ড্রেজিং পলিসি প্রণয়ন করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

২৩

বুদ্ধিজীবি এবং মৌলবাদীদের ব্যাপারে আমার অভিমত

আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবি নামে একটি গোষ্ঠি আছে। এই বুদ্ধিজীবিরা মাঝে মাঝে পত্রিকায় তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে অনেকে ধর্ম নিরপেক্ষ এবং নাস্তিক শিক্ষক, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অংকন শিল্পী, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক এবং আরো কিছু পেশাদার রহিয়াছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই বুদ্ধিজীবিদের সাথে জনগোষ্ঠীর কোন যোগাযোগ নাই। তাঁহারা নিজেদেরকে দেশের সত্যিকার বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং দেশপ্রেমিক মনে করেন। তাঁহাদের বক্তব্যে একটি ধারা থাকে সেটা" ইসলাম ধর্ম বিরোধী ধারা" এবং হিন্দু সভ্যতার ও কৃষ্টির স্বপক্ষে কথা বলিয়া এই দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তাই এই বুদ্ধিজীবিরা আমাদের দেশের এবং জনগণের মংগল কামনা করিতে পারে না।

মৌলবাদীরা আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াইয়া আছে। তাহাদের একটা সুবিধা এই দেশের মুসলমানরা ধর্মপ্রাণ এবং সেই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের মৌলবাদীরা ইরান, আলজেরিয়া বা সুদানের মৌলবাদীদের মত কট্টর পন্থী নয়। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার না করিয়া সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মকে কিভাবে মানুষের মংগলের জন্য ব্যবহার করা যায় সেইভাবে আগাইয়া আসিলে সর্বক্ষেত্রে শান্তি আসিবে। মৌলবাদীরা ধর্ম নিরপেক্ষ নয় এবং নাস্তিক নয়। তাহারা যদি সময়ের সাথে তাল মিলাইয়া ধর্মকে মানুষের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার সেইভাবে কাজে লাগায় তাহা হইলে সমাজ হইতে সন্ত্রাস, দূর্নীতি এবং অন্যান্য অপকর্ম বিতারিত হইবে। সমাজের সর্বস্তরের সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আমি আশা করি মৌলবাদীরা তাহাদের নীতি পরিবর্তন করিবে এবং দেশের চাহিদা মত জনস্রোতে মিশিয়া কাজ করিবে। তাহা হইলে মৌলবাদী বলিয়া তাহাদিগকে কেহ আখ্যায়িত করিবে না।

www.pathagar.com

২৪

মাহফুজ ওয়েল ফেয়ার ক্লিনিকে এবং সমাজ সেবায় কর্ম ব্যস্ততা

ঢাকা শেরাটন হোটেল হইতে অবসর নেওয়ার পর চিন্তা ভাবনায় কয়েক দিন কাটাইয়া দিলাম। আমার চেম্বার প্র্যাকটিস নিয়া থাকিব না কর্মক্ষেত্র আরো বৃদ্ধি করিব। শেষ পর্যন্ত স্থির করিলাম যে, শেওড়া পাড়ায় সাড়ে আট কাঠা জমির উপর বিল্ডিং করিয়া ক্লিনিক স্থাপন করিব। ১৯৮৭ সনে মার্চ মাস হইতে বিল্ডিং এর কাজ শুরু করি। ১৯৮৯ সনের নভেম্বর মাসে বিল্ডিং এর কাজ শেষ হয়। ক্লিনিকের আসবাবপত্র, আধুনিক প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ৩০০ এম. এ. স্কে-রে মেশিন স্থাপন, আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন স্থাপন, অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুম সজ্জিত করিতে আরো ৩ মাস প্রয়োজন হয়।

কুয়েতের জাতীয় দিবসে ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশে কুয়েতের প্রথম রাষ্ট্রদূত মহামান্য সউদ আবদুল আজিজ আল-হুমাইদি এবং ম্যাডাম হুমাইদির সাথে লেখক (ডান দিকে) এবং তদীয় স্ত্রী খালেদা বেগম (বাম দিকে)

www.pathagar.com

১৯৯০ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী মাসে মাহফুজ ওয়েল ফেয়ার ক্লিনিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার নামে শুরু করি। এই ক্লিনিকের দ্বার প্রাথম দিন হইতে সকলের জন্য খোলা রহিয়াছে। যাহারা গরীব বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা বিনা খরচে দেওয়া হয়। পরবর্তী চিকিৎসা নিজে করিবে। ক্লিনিকে ঢোকার সময় সম্মুখে চোখে পরিবে ক্লিনিকের দৈনিক "ফ্রি ক্লিনিকের" সময় সূচী। এই সময় সূচী ছাড়া নিঃস্ব গরীব রোগীরা জরুরী চিকিৎসার জন্য যে কোন সময় আসিতে পারে। এই স্বল্প চিকিৎসার ব্যবস্থা যদি সকল ক্লিনিকে থাকিত তাহা হইলে অনেক দুঃস্থ রোগীদের কষ্টের লাঘব হইত। এই ক্লিনিকের অন্যান্য খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই খরচ আরো কমানো সম্ভভপর হইবে যদি সার্জেন, গাইনোকোলজিস্ট এবং অন্যান্য স্পেশালিষ্টরা নিজেদের অপারেশন চার্জ আরো কমাইয়া দেন।

মাহ্ফুজ ওয়েলফেয়ার ক্লিনিকে লেকক নিজ কার্য্যালয়ে। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

এই ক্লিনিকটি তিন তলা দালানে বিশটি বেডে সজ্জিত করা হইয়াছে। একটি কামড়ায় ২টি বেড এবং টয়লেট সংলগ্ন এইরূপ সাতটি কেবিন এবং ৩টি বেডের দুইটি কামড়া রহিয়াছে। ক্লিনিকটিতে মেডিক্যাল সার্জিকেল এবং প্রসূতি ও গাইনির চিকিৎসা করা হয়। ২৪ ঘন্টা রোগীদের সেবায় ডাক্তার এবং নার্স

www.pathagar.com

নিয়োজিত আছে। চারি জন ডাক্তার, চারিজন নার্স, চারিজন টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য কাজে আরো আট জন কর্মচারী আছে। ২০ জন কর্মচারীদের মাসিক বেতন মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। কোন অবসর গ্রহণ না করিয়া বিগত একচল্লিশ বছর ধরিয়া একটানা একটার পর আরেকটা পেশাগত কাজ করিয়া যাইতেছি। সরকারকে নিয়মিত আয়কর এবং সম্পদ কর প্রতি বছর দিতেছি। আল্লাহ্ তায়ালার উপর অগাধ বিশ্বাস, পরিশ্রম, ঈমান, ধর্মের কার্য্যক্রম পালন এবং স্বল্প খরচে চলার অভ্যাস আমার জীবনের চলার পথে সাথী রূপে আছে। কোন সময় অনিয়মকে প্রশ্রয় দেই নাই। দূর্নীতি এবং সন্ত্রাসকে সব সময় ঘৃণা করিয়াছি। আমার শক্তি অনুযায়ী সেই হীন কাজগুলি দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

নিজের সাধ্যমত দান করা, ধর্মের এবং সমাজের উপকার হইবে সেইরূপ কাজ করা আমার পেশাগত কাজ কর্মের সাথে চলিয়াছে। কবরস্থানের উন্নয়ন, মসজিদের উন্নয়ন, মসজিদ তৈয়ারী করা এবং দুঃস্থদের সাহায্য করা আমার শেষ বয়সে দৈনন্দিন কাজরুপে চলিতেছে। এই কাজগুলির মধ্যে পূর্ব শেওড়া পাড়ায় দুইটি মসজিদের বড় ধরনের উন্নয়ন কাজ, আটি বাজার মসজিদের ৮'×১২' সাইজের তিন তলার উচ্চতায় ৪ ফুট উচু পানির ট্যাংক, দোতলায় ইমাম সাহেবের ঘর এবং নীচ তলায় ষোল সীট বিশিষ্ট অজুখানা। আমার নীতি যে অংশের কাজ ধরি তাহা সম্পূর্ণভাবে শেষ করি।

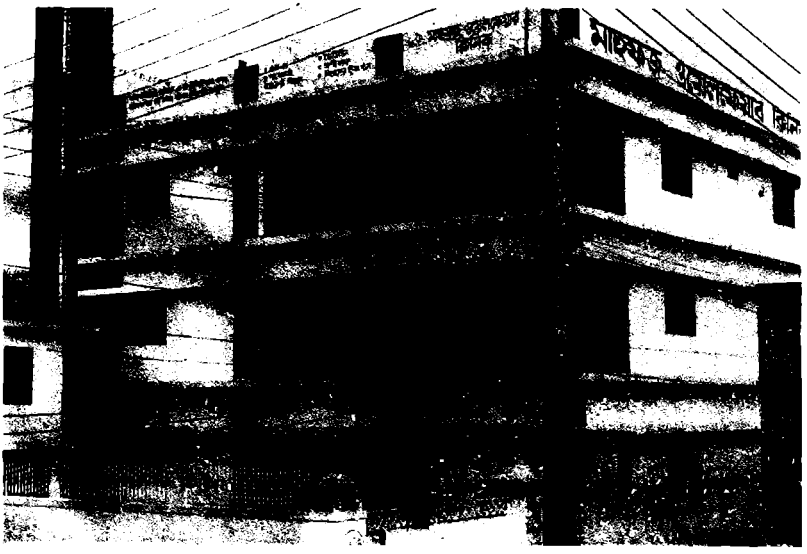

মাহ্ফুজ ওয়েলফেয়ার ক্লিনিকের সম্মুখের ভবনের একাংশ।

www.pathagar.com

জয়নগর গ্রামের কবরস্থানটি একটি ডোবার মত ছিল। সেইটি ছয় ফুট মাটি ভরাট করিয়া বিশ হাজার বর্গফুট কবরস্থানের উন্নয়ন করি। জয়নগর গ্রামের সমাজ কল্যাণ ভবন তৈয়ারি করি। সেই ভবনটি এখন যুবকদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে কাজ করিতেছে। ১৯৯৫ সনের জানুয়ারী মাসে জয়নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষু শিবিরের বন্দোবস্ত করি। জয়নগর এবং আটি এলাকায় কয়েকটি রাস্তা তৈয়ার করি। তাহার মধ্যে জয়নগর গ্রামে মসজিদে এবং সরকারী প্রাইমারী স্কুলে যাইবার জন্য পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়াছি। রাস্তাটি লম্বা ২৫০ ফুট, ১০-১২ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট উচু। বায়তুল মাহফুজ আটি কুটি জামে মসজিদ রোড মসজিদে এবং গ্রামে যাইবার জন্য আরেকটি পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়াছি। রাস্তাটি ৩২০ টি লম্বা, ৬-৭ ফুট চওড়া এবং ৪-৫ ফুট উচু। এই রাস্তার খালের দিকে একটি পাকা সেতু তৈয়ার করিয়াছি। এই সেতুটি ছয়টি স্তম্ভের উপরে খারা, ৬০ ফুট লম্বা, ৭ ফুট চওড়া এবং সেতুর মাঝ প্রায় ১৫ ফুট উচু। আটিকুটি গ্রামের লোকদের চলাচলের জন্য আরেকটি পাকা রাস্তা "দক্ষিণ-পশ্চিম জনপথ" তৈয়ার করিয়াছি। এই রাস্তাটি ২১৫ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া এবং ৩-৫ ফুট উচু।

১৯৯৬ সনের ১৫ই নভেম্বর তারিখে বায়তুল মাহফুজ আটিকুটি জামে মসজিদ উদ্বোধন করিয়াছি। এই মসজিদটি ভিতরের দিকের ৬ কাতারে ৩০ ফুট এবং পাশে ৪০ ফুট। বারান্দার উত্তর দিকের মুসল্লিদের অজুখানা এবং অজুখানার সম্মুখে ইমাম সাহেবের থাকার ঘর আলাদা ভাবে করা হইয়াছে। মসজিদের পায়খানা এবং প্রস্রাবখানা দক্ষিণ পশ্চিমে পিছনের দিকে করা হইয়াছে। আল্লাহতালার নিকট মোনাজাত করিতেছি, যাহাতে এই মসজিদের মুসল্লিদের নামাজ কবুল করেন। এই দোয়ার সাথে সাথে আমার সত্তর বছর জীবনের ঘটনাবলী এখানেই শেষ করিলাম।

www.pathagar.com

জয়নগর চক্ষু শিবির উদ্বোধন করেন লেখক ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৫ সনে।

জয়নগর সমাজ কল্যাণ ভবন।

তৈয়ার ১৯৯৪ সন। ফটো ৩১.১.৯৫

www.pathagar.com

জয়নগর কবরস্থানের মাটি ভরাট এবং উন্নয়ন কাজ শেষ করে উদ্বোধন করা হয় ১৫ই জুলাই ১৯৯৪ সনে। ফটোর তারিখ ৩১.১.৯৫

বায়তুল মাহ্‌ফুজ আটিকুটি জামে মসজিদ খননকাজ শুরু। তারিখ ১২ এপ্রিল ১৯৯৬, ২৯ চৈত্র ১৪০২, ২৩ জিলকাদ ১৪১৬ দিন শুক্রবার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com